সমাজসমালোচন।

প্রথম ভাগ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

প্রণীত।

চঁচড়া।

সাধারণী যন্ত্রে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৪।

ভূমিকা।

বঙ্গদর্শনের প্রকাশ আরম্ভাবধি আমি মধ্যে মধ্যে তাহাতে কতক গুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রবন্ধ গুলি ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে মাননীয় বঙ্গদর্শন সম্পাদক আমাকে প্রথমে অনুরোধ করেন। " সমাজ সমালোচন " নাম দিয়া গুটি কত প্রকাশ করিব ইচ্ছা করিয়াছি। এই প্রথম ভাগে দুইটি মাত্র প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইল। 'উদ্দীপনা' এবং 'বাবু'। এরূপ দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির প্রবন্ধ একত্র প্রকাশ করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, বলিতে পারি না।

কদমতলা
চুঁচুড়া।
১২৮১ পৌষ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সমাজ-সমালোচন।

উদ্দীপনা।

ভারতবর্ষে অনেক ভাল বস্তু ছিল; তাহার অনেক একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; অনেক লুপ্তপ্রায়; অনেক নির্জীব ও মরণাপন্ন; ও অনেক বিকৃত ভাবাপন্ন। আবার অনেক ভাল বস্তু ছিল না। কিম্বা মধ্যে মধ্যে হইয়াছিল মাত্র। যা ছিল তা আবার হইবে। কিন্তু যা ছিল না, না থাকাতেই এত সর্ব্বনাশ, অথবা যা ছিল, থাকাতেই এত সর্ব্বনাশ, তাহারই অনুসন্ধান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান করিয়া যে ভাল বস্তুটি ছিল না, তাহা কিসে সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা, যদি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে অতি যত্নপূর্ব্বক তাহার পোষণ করা, অতি কর্ত্তব্য। যে মন্দ বস্তুটি ছিল, তাহা যদি এখন আর না থাকে, তবে যাহাতে সেটি আর পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে, এমন সাবধান হওয়া উচিত, এবং যে মন্দ বস্তু গুলি এখনও জীবিত রহিয়াছে, সে গুলি যাহাতে সমাজ হইতে একেবারে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা যুক্তিযুক্ত।

এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। এটি সমাজের স্বাস্থ্য জন্য থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। 'ছিল না' এই শব্দটি ন্যায় মতের "অভাব পদার্থ" জ্ঞাপক বোধ করিতে হইবে না। "আমার রোগে রোগে আর শরীরে কিছু মাত্র বল নাই" বলিলে, বলের নিরবচ্ছিন্ন অভাব বুঝায় না। যত টুকু বল শরীরের সহজ অবস্থায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সে টুকু নাই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ সমাজ সম্বন্ধেও বুঝিতে হয়।

সমাজ-সমালোচন।

আমাদের এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। উদ্দীপনা শক্তি ছিল না। ডিমস্থিনিস, সিসিরো, আমাদের এক জনও ছিল না। [যে বাক্‌শক্তি ইউরোপে এলোকোয়েন্স বলিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহা আমাদের ছিল না।] অলঙ্কারকারেরা উদ্দীপন বিভাবের বর্ণন ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। উদ্দীপন বিভাবকে তাঁহারা রসের একটি অঙ্গ বলেন। রসকে কাব্যের সারভূত পদার্থ বলেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" কিন্তু কবিতাশক্তি ও উদ্দীপনাশক্তি, দুটি যে বিভিন্ন এ কথা সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন না। যেমন কাব্যের সার রস, তেমনি উদ্দীপনার সারও রস। কাব্যসার রস যেমন করুণ, বীর, প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; উদ্দীপনার সার রসও ঠিক সেইরূপ নানা ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কাব্য রস বর্ণনে যেমন আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি বিভাবের আবশ্যকতা ও যেমন নানা প্রকার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব উদিত হয়, সেইরূপ উদ্দীপনা রসেও আলম্বন উদ্দীপন প্রভৃতি নানা বিভাবের আবশ্যকতা ও তাহাতেও সেইরূপ নানা প্রকার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব উদ্ভূত হয়। আপাততঃ দৃষ্টিতে কবিতা ও উদ্দীপনা এক বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহারা সহোদরা মাত্র। এক গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই জনে কালে দুই বিভিন্ন গোত্রে পরিণীতা হইয়াছেন। এক্ষণে দুই জনের বিভিন্ন গোত্র বলিতে হইবে। উদাহরণে শীঘ্র বুঝা যাইবে। একই বিষয়, উদ্দীপনা কিরূপ ভাবে বলেন, শুনুন; আর কবিতাই বা কিরূপে বলেন, পরে শুনিবেন। উদ্দীপনা বলিতেছেন।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরে গলায় হে, কে পরে গলায়॥
যবনের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে, ক্ষত্রিয় তনয়।
এ কথা যখন হয় মনেতে উদয় হে, মনেতে উদয়।
* * * * * *
অই শুন অই শুন ভেরীর আওয়াজ হে, ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে, সাজ সাজ সাজ।"

(পদ্মিনী উপাখ্যান।)

সেই স্বাধীনতা বিষয়েই অন্যবার কবিতা কি বলেন, শুনুন ;—

"সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। বঙ্গজয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম। আকাশের সামান্য নক্ষত্রটিও অস্ত গেলে পুনরুদিত হয়।" (মৃণালিনী।)

দুইটিই রসাত্মক বাক্য। কিন্তু প্রথমটি কখনই আপনা আপনি বলা যাইতে পারে না। কোন এক বিশেষ ব্যক্তি ইহার উদ্দেশ্য, তাহার আর সংশয় নাই। রসাত্মক বাক্য বটে, কিন্তু বক্তার সম্মুখে এক জন শ্রোতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়টি স্বতঃস্খলিত রসাত্মক বাক্য-মাত্র। হইতে পারে, কবি যখন ঐ কথা গুলি কণ্ঠ হইতে বহির্গত করিতেছিলেন, তখন অনেক লোক তাঁহার নিকটে ছিল, ও সেই কথা শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনই তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া সে কথাগুলি উচ্চারণ করেন নাই। তিনি আপনি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ শুনিল কি না, তাহাতে তাঁহার মনোযোগ নাই।

কিন্তু উদ্দীপনা সর্ব্বদাই লোককে ডেকে কথা কন। পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনের রস উদ্ভাবন, অন্যকে কোন কার্য্যে লওয়ান, এইরূপ একটি না একটি তাঁর চির উদ্দেশ্য। তিনি সর্ব্বদাই ডাকিতেছেন। নিজ মন হইতে একটু রস তোমার মনে ঢালিয়া দিলেন, তুমি হয়ত সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, কখন বা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলে, কখন বা তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিলে। উদ্দীপনা চরিতার্থ হইলেন। তিনি যে রস তোমার মনে উদ্দীপন করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা করিলেন; সুতরাং চরিতার্থ হইলেন। কবিতা সেই প্রকৃতির নহেন। তিনি কাহাকে ডাকেনও না, নিজে হাত তুলে কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না। তিনি কখন বসন্তসমীরবিতান্দোলিতা, প্রস্ফুটিতা, ভূরি প্রস্ফুটিতা, সদ্যঃজল সিঞ্চিতা, কচিৎ ভ্রমরভর-স্পন্দিতা, যথিকালতারূপে বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কাহাকে ডাকেনও না,

কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না। চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত হইতেছে; তিনি সেই গন্ধ বিস্তার করিয়াই সুখানুভব করিতেছেন। তাহাতেই চরিতার্থ হইতেছেন। সে গন্ধ কেহ ঘ্রাণ লইল কি না, সে শোভা কেহ দেখিল কি না, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নাই। তুমি নিকটে যাইবামাত্র গন্ধে ভোর হইলে, সেই অতুল শোভা দেখিয়া তোমার নয়ন তৃপ্ত হইল, তোমার মানস মোহিত হইল, তুমি চরিতার্থ হইলে; লতার তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। লতা ফুটিয়াই চরিতার্থ হইয়াছে। কবিতা কখন বা জ্বলন্ত অনল রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ধূউ ধূউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে; শোঁও শোঁও করিয়া শব্দ হইতেছে; মধ্যে মধ্যে চট্ চট্ শব্দে কর্ণকুহর বধির হইয়া যাইতেছে। সহস্র শিখা গগন স্পর্শ করিয়াছে। চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে। তেজে দিঙ্মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তাপ ক্রমেই চারি পার্শ্বে বিস্তার করিতেছে। কবিতা রূপ ধারণ করিয়াই চরিতার্থ হইতেছেন। তুমি দূর হইতে ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখিতে পাইলে, ঝঞ্ঝা আগমন লক্ষণবাহী শব্দ সদৃশ সেই তুমুল আরাব শুনিতে পাইলে, ভয়বিস্ময়ে তোমার চিত্ত পরিপূরিত হইল, তুমি নিকটে গেলে, উদ্গীরিত উত্তাপে তোমার গাত্র অভিষিক্ত হইল। যদি তুমি শীতার্ত্ত হও তোমার সুখস্পর্শ হইল। পতঙ্গবৎ অতি নিকটে যাও, তুমিই অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রচণ্ড অগ্নির তাহাতে কিছুই হইবে না। কখন বা কবিতা প্রেতভূমিরূপ ধারণ করিয়া নদীকূলে শয়ন করিয়া থাকেন। রাশি২ অঙ্গার বিকীর্ণ রহিয়াছে; অঙ্গারে অর্দ্ধ পূরিত চুল্লী; অর্দ্ধ দগ্ধ বংশখণ্ড; অর্দ্ধভঙ্গ, অল্পভঙ্গ, সচ্ছিদ্র, অচ্ছিদ্র, মৃৎকলস, কত গড়াগড়ি যাইতেছে; কোন কোনটার ভিতর সন্ধ্যাবায়ু প্রবেশ করাতে হো হো করিয়া শব্দিত হইতেছে; সমস্ত স্থান, অস্থি-কপাল-কঙ্কাল-কেশ-পরিপূরিত। দক্ষিণে জলসমীপে একটি চিতা জ্বলিতেছে। এক ব্যক্তি একটা বাঁশ লইয়া একটি চিতাস্থিত শবের উদরে বেগে আঘাত করিল। শব দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিল; তোমার বোধ হইল যেন হাত নাড়িয়া বারণই করিল। তুমি পলায়নপর হইয়া বাম দিকে দেখিলে; দেখিলে, ভগ্ন ঘাটের উপরি প্রৌঢ়া

মাতা অপোগণ্ড নবকুমার শিশুকে বটতলায় শোয়াইয়া ছন্দেবন্ধে ক্রন্দন করিতেছেন। দূরে, বোধ হইল একজন লোক বসিয়া আছে। নিকটে গেলে। এ কি! সদ্য মরা শব হেলান্ দিয়া বসান রহিয়াছে। তুমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিহরিয়া উঠিলে। একটা কৃষ্ণকায় কুকুর তোমার সেই চাহনি দেখিল; ঐ শবের দিকে দেখিল; উভয়ে কি প্রভেদ যেন কিছুই না বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা সমীরণ সঞ্চালনে তোমার কর্ণমূলে কে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল; কলসের হো হো শব্দে কে যেন হো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তুমি আড়ষ্ট, আতঙ্ক, নিস্পন্দ, তুষ্ণীভূত, চকিত ও স্থগিতনেত্র। দূরে একটি শিবারব তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তুমি চারি দিকে দেখিয়া ভয়, বিস্ময়, বিরাগ, জুগুপ্সা পরিপ্লবিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে। তোমার এত ভাবান্তর হইল, শ্মশানের কি হইল? কিছুই নহে।

কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। সুতরাং নির্জনে বিরলে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি; এবং অনেক লোকের সহিত আলাপ ও কথোপকথনেই উদ্দীপনার জন্ম হইয়া থাকে। কেন পূর্ব্বতন কালে আমাদের কবি,—পুঞ্জ পুঞ্জ কবি ছিলেন, ও এক জনও উদ্দীপক ছিলেন না, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয়দের মত বোধ হয় এমন নির্জনস্পৃহ জাতি,—এমন নির্জনচিন্তাস্পৃহ জাতি,—পৃথিবীতে আর ছিল না, এখনও বোধ হয় আর নাই। বোধ হয় এই জন্যই এত কবি,—প্রকৃত কবিপদবাচ্য কবি, এক দেশে এত আর কখনই জন্মে নাই। আজিও কোথাও জন্মিতেছে না।

সংসার ভাল মন্দ মিশ্রিত; সুখ দুঃখ জড়িত। যেখানে গুণ আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে দোষ আছে; নিরবচ্ছিন্নতা, পূর্ণতা, অত্যন্তাভাব, এগুলি আধ্যাত্মিক পদার্থবাচক, সাংসারিক অবস্থাজ্ঞাপক নহে। এক দিকে কিছু বেশী লাভ হইয়াছে কি, অন্য দিকে, সেই পরিমাণে ঠিক না হউক, কতক ক্ষতি অবশ্যই হইয়াছে। জগতের জমাখরচ সকল সময় ঠিক মিল থাকে কি না, তা বলা যায় না। কিন্তু কারবার চলিতি। কোন কুঠিতে আজি,

মাল আমদানি হইল, জমার অঙ্ক খরচের অঙ্ক হইতে দেখিতে অনেক বেশী বোধ হইতেছে, অন্য কুঠির্তে সেই সময় এত বিলাত-বাকি যে সে কুঠি চালান ভার। কিন্তু সমস্ত জগতের কারবার চির কালই চল্‌তি। সামান্য খণ্ডসমাজেও সেইরূপ। যাঁহার উপর লক্ষীর কৃপা হইয়াছে, সপত্নী, সরস্বতী তাঁর দিকে প্রায় চেয়ে দেখেন না; লক্ষী আবার তেমনি সপত্নী বরপুত্রদের পল্লীতেও পদার্পণ করেন না। যশোরাশি মানধন পণ্ডিত-প্রবর অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা লইয়া বিব্রত; দাসদাসী পরিবেষ্টিতা রূপযৌবন-সম্পান্না সুশীলা সতী মাদকসেবনশীল উদ্ধত স্বামী নিগ্রহে দিন দিন ম্রিয়মাণা হইতেছে। কেহ বা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, আয়াসসাধ্য যাগ করিয়া, একটী পুত্রের কামনা করিতেছে, অন্য এক ব্যক্তি সোণার চাঁদ ছেলেদিগকে, ননীর পুতলি মেয়েগুলিকে, দু বেলা দুটো মাছে ভাতে, পূজার সময়ে এক এক খানি নীলেছোবান কোরা কাপড় দিতে পারিতেছে না। এই জন্যই কেহ শীঘ্র অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চায় না। কিন্তু তবু যদি উচ্চরবে জিজ্ঞাসা করি, "আপনার অবস্থায় কে অসন্তুষ্ট" প্রতিধ্বনি অমনি তখনি মুখের উপর উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিবে, "হায়! কে সন্তুষ্ট?" সকলেই অসন্তুষ্ট, সকলেই সন্তুষ্ট। জগতের একটী বিচিত্র কৌশলই এই, যদি এক দিকে কিছু কম থাকে, নিশ্চয় আর এক দিকে কিছু বেশী আছে।

আমাদের অনেক কবি ছিলেন, অনেক কাব্য ছিল, সেই জন্যই আমাদের দেশে এক জনও উদ্দীপক ছিলেন না; উদ্দীপনা ছিল না। যে নিভৃত চিন্তা কবিতা থাকার কারণ, সেই নির্জনস্পৃহাই উদ্দীপনা না থাকার কারণ। সেই নিভৃত চিন্তাই এখনও আমাদের বাঙ্গালি জাতিকে গুমরে গুমরে পোড়াইতেছে। এই যে সমস্ত বঙ্গজাতি টপ্পাগান প্রিয়, তাহাতে কি বুঝায়? বুঝায় এ দেশে এখনও উদ্দীপনার বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই; আপনার কথা আপনি বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত, তাহাই যথেষ্ট; এবং তাহাতেই আমাদের চরিতার্থতা।

ভারতবর্ষীয়েরা যেমন নির্জনস্পৃহ ছিলেন, তেমনি স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন। ভাল মন্দ উভয়ই প্রয়োজনের অনুচর। সংসারে, সমাজে,

গৃহে, আচরণে, সকল বিষয়েই প্রয়োজন একা শাসনকর্ত্তা। প্রয়োজনই সর্ব্বেসর্ব্বা। বাস্তবিক প্রয়োজনের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রকেও পরাজিত হইতে হয়, প্রয়োজনশাসন সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। এই জন্যই আমাদের সামান্য কথায় বলে যে "গরজের উপর আইন নাই।" এই জন্যই সামান্য কথায় বলে যে "অরে দুই প্রহর বেলা সিঁধ কাটিতেছিস যে?—না আমার গরজ।" কিন্তু প্রয়োজনে যেমন মন্দ বস্তু হয়, তেমনি ভাল বস্তুও হয়। ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের কিছুই আর নূতন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং অনেক মন্দ বস্তুও জন্মে নাই, অনেক ভাল বস্তুও জন্মে নাই। উদ্দীপনাও জন্মে নাই।

——(*)——

(২)

ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বতঃ সন্তুষ্ট জাতিছিলেন, তাহা ভারতের যাহা কিছু পর্য্যালোচনা করিবেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। ভারতের সমাজ ভাগ দেখুন। ব্রাহ্মণে নিভৃতে চিন্তা করিলেন, বিবেচনা করিলেন, ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষত্রিয় বিদেশীয় শত্রুর বাহ্য আক্রমণ নিবারণ করিলেন, দস্যু হইতে আভ্যন্তরিক রক্ষা করিলেন। বৈশ্য বাণিজ্যে কৃষিকার্য্যে জীবন যাপন করিলেন। শূদ্র দাস। সমাজের ভাগ যেন ভূগোলের ভাগ। চারিটি খণ্ডদেশ লইয়া যেমন একটী দেশ, তেমনি চারিটি জাতি লইয়া একটী হিন্দু জাতি হইল। ঠিক যন্ত্রের মত সমুদায়। প্রয়োজন নাই, অভাবও নাই, কষ্টও নাই। কে কাহার মনে কি উদ্দীপন করিতে যাইবে? প্রয়োজন কি? জীবনে দেখুন। ব্রাহ্মণ শিশু আট বৎসর বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত পিতামাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইলেন। উপনয়ন হইল। সেইটী তাঁহার বিদ্যারম্ভ। তিনি তখন ব্রহ্মচারী। [বোর্ডিং ইউনিবর্সিটির বোর্ডর।] কেহ বার বৎসর, কেহ ষোল, কেহ বিংশতি বৎসর পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, বিবাহ করিলেন। ক্রমে স্থবির বয়সে বনে গেলেন। নদীস্রোতের ন্যায় জীবন স্রোতঃ। পিতা মাতার অনুকরণ করিলেই, শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করা হইল। যুক্তি ও স্বার্থও তাহার বিপরীত,

কিছুই বলিতে পারিত না। সুতরাং যুক্তি এবং স্বার্থ সঙ্গতও হইল; সমাজ সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে লাগিল। এ দিকে দেখুন বসুন্ধরা ভূরি শস্যপ্রসূতি; খনি রত্নগর্ভা; ভারত ফলফুলের উদ্যান বলিলেই হয়। কথায় বলে, পৃথিবীর সকল জিনিষের নমুনা ভারতে আছে। পূর্ব্বকালে যে সেই রূপ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিছুরই অভাব নাই। প্রয়োজন নাই। সুতরাং যাহার কাহাকে কিছুই বলিতে হইল না, তাহার উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? তিনি কবি হইলে হইতে পারেন। হায়! রোগশোকদুঃখজরামরণসঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে কবি। যাঁহার লেখা পড়া বোধ আছে, যিনি আপনার মনের ভাব, ভাষায় সুন্দর রূপে গাঁথনি করিতে পারেন, তিনিই প্রকাশ্য কবি। কিন্তু অন্তরে অন্তরে সকলেই কবি। যিনিই মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে "হায়! বুঝি হারাইলাম!" বলিয়াছেন, তিনিই অন্তরে কবি। এক্ষণে অন্তরে কবি নয় কে? তাহাতেই বলি; হায়! রোগশোকদুঃখজরামরণসঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? আবার এদিকেও বলি—ও হো হো! সুখশান্তি-সৌন্দর্য্যশোভাপ্রীতিপূরিত মজার সংসারে কবি নয় কে? আমরা সকলেই অন্তরে কবি। কোন নারীর স্নেহ, আদর বা প্রীতিতে গলিয়া গিয়া, যিনি "মা," "দিদী" বা "প্রেয়সী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনিই অন্তরে কবি। যে হাসে নাই, কাঁদে নাই, সে মনুষ্য নয়; জীবন্ত পুতুল। মনুষ্যমাত্রেই অন্তরে অন্তরে কবি। সংসারে নানা রস ছড়ান রহিয়াছে, অবস্থানুসারে তিক্ত মিষ্ট লবণ আস্বাদন করিতে হইতেছে। মানব যদি কুশিক্ষায় অ-রসিক, অভাবুক না হইয়া থাকেন, তাঁহাকে কবি হইতেই হইবে। কবিত্ব মনুষ্যের স্বভাবধর্ম্ম। উদ্দীপনা সেরূপ নহে, ইহা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষরূপে পরিণত, বৰ্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতে উদ্দীপনার বীজ মৃত্তিকা আশ্রয় করিতে পারে নাই। স্রোতের বলে কয়বার চরে লাগিয়াছিল, ও সেই কয়বারই বীজ অঙ্কুরিত, লতা পল্লবিতা ও পুষ্পিতা এবং বোধ হয়, ফলভরেও অবনতা হইয়াছিল। পুরাবৃত্তের কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ ঘটনা

হয়, তাহাও আমাদের দেখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জল বায়ুতে বীজ অঙ্কুরিত ও লতা বর্দ্ধিতা হয়, তাহা না জানিলে, কখনই আমরা কৃষিকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারি না; সেই কৃষিকার্য্যও এখন বিশেষ আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতোবাহিনীতে আমরা বড় অধিক দিন বা অধিক বার সঞ্চরণ করি নাই। ভারত নদী বিপুলা; চর দেখিলাই, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র তরী সেই প্রবাহে বিসর্জ্জন করিতে ভরসা পাই। নাবিক পাই নাই, পাইলট পাই নাই, সুতরাং কয়টি বৃহৎ বৃহৎ চরে লাগাইয়া, সেই কয়টী দেখিয়াই, প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রায় কখনই লক্ষ্যে পড়ে নাই। যদি কখন দূরে একটী কাল মেঘের মত মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাকি, ভরসা করিয়া যাইতে পারি না। আর পাঁচজন সঙ্গী পাইলেও বা ভরসা হয়। তা কে কোথায়, কাহাকেও দেখি না। তখন ভয়ে বিষাদে বাগশ্রীতে বলিতে হয়,—

" তরি নাহি দেখি আর, চারি দিকে অন্ধকার।
বুঝি প্রাণ যায় এবার, ঘূর্ণিত জলে।"

এইরূপ অবস্থায় একবার একজন বিলাতি পাইলটের সঙ্গে দেখা হয়। তাহাকে দেখিয়া মনে কিছু ভরসা হয়। সাহেবেরা নৌবিদ্যায় কিছু পটু, তাহাতে জাতিতে ইংরেজ, সাহসও বিলক্ষণ আছে। পাইলট অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়াই, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। সাহেব আমাদিগকে বলিলেন, ঐ যে দূরে চর দেখিতে পাইতেছ, ঐটি মহাভারত, আর তার এদিকে এই যে দেখিতেছ, এইটি রামায়ণ। আমরা সিহরিয়া উঠিলাম। দ্বাপরের পর ত্রেতা যুগ হইল, এ যে ঘোর কলি! সাহেবের প্রতি একেবারে অশ্রদ্ধা জন্মিল। তখন সেই পূর্ব্বের গানের মোহাড়াটি গাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

" কোথায় আনিলে হে—
পথ ভুলায়ে হে—॥"—

সেই অবধি আর কাহারো সঙ্গে ভারত নদীতে যাই না।

পরশুরামের ক্ষত্রিয়লোপকর্তৃত্বাবদর্শনসম্বন্ধে আমরা পৌরাণিক আখ্যায়িকা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। কিন্তু তাহার পর রাম অবতার। দক্ষিণবিজয়ই রামায়ণবৃত্ত। যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে, আর রাজ্য লইয়া বিবাদ ছিল না; যখন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যসন্তানেরাই বাস করিতেছিল, তখনই রামায়ণের ঘটনা সমস্ত ঘটে।

তখন দক্ষিণাত্য অনার্য্য ভূমি, রামচন্দ্র, যে উদ্দেশেই হউক, এই অনার্য্য ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, ইহার সীমান্তর্বর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত বিজয় করেন। আর্য্যাবর্ত্তের সীমা ছাড়াইয়াই, নির্জ্জনস্পৃহ আর্য্য মুনিগণের তপোবন ছাড়াইয়াই, রাম এক জাতি দেখেন। এ জাতি অতি প্রাচীন; আর্য্যেরা ইহাদিগকে জানিতেন। আর্য্যগণের পীড়নে ইহারা বহিষ্কৃত হইয়া,—উত্ত্যক্ত হইয়া, দক্ষিণে বাস করিতেছিল। আর্য্যেরা ইহাদিগকে মাংসপ্রলোভী জানিয়া, ঘৃণা করিত ও চণ্ডাল বলিয়া, হেয় অভিধান দিয়াছিল। শ্রীরামকে স্বকার্য্য উদ্ধার জন্য এই জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইয়াছিল। রামায়ণের এই ঘটনাই গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্রনিবন্ধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরে এক অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যাইয়া, কোন দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সেই দলকে পরাজয় এবং কোন দলের সহিত বা সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। ইহাই রামায়ণে বালিরাজের বধ ও সুগ্রীবসহ বন্ধুত্ব বলিয়া বর্ণিত। চণ্ডালেরা হিন্দুসমাজবহিষ্কৃত বটে, কিন্তু বানরগণের ন্যায় অসভ্য নহে। কিন্তু বানরগণ চণ্ডালগণ অপেক্ষা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। কেননা তাহারা দাক্ষিণাত্যের আদিমবাসী, চণ্ডালগণের ন্যায় আর্য্যনির্ব্বাসিত জাতি নহে। পরে রামচন্দ্র নরমাংসলোভী, নরমাংসভোজী বিকৃতাকার এক জাতিকে প্রায় একেবারে লোপ করেন। ইহাই রাবণের সবংশে বধ। ইহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। যেমন আমেরিকার নরকপাল-সংগ্রহকারী, নরবলিপ্রতিষ্ঠাকারী অজতেকজাতির মধ্যে অনার্য্য সমৃদ্ধির বিশেষ পুষ্টি হইয়াছিল, রাক্ষসদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। আর্য্যগণের ন্যায় তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রবিভাগ ছিল না। সকলেই যোদ্ধা ও ধনুর্দ্ধারী, বেদাচারবহির্ভূত, অথচ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী।

রামায়ণ ঘটনার স্থূল মর্ম্ম এই, কিন্তু এগুলি গুরুতর ঘটনা। বৈদিক একগতির রোধকারী। ইহাতেই বৃহৎ চর উৎপন্ন হয়। রামকে (তিনি একজনই হউন, আর অনেক জনই হউন,) একটি অসাধারণ বিপ্লব করিতে হইয়াছিল। যে চণ্ডালকে দর্শন করিতে নাই, তাহার সহিত বন্ধুত্ব। সামান্য বর্ণনে বলে, গুহক চণ্ডালের সহিত কোলাকুলি। কন্দ-মূলফলাশী বানর সদৃশ জীবের হৃদয়ে বীররসের উদ্ভাবনা, পৃথক্ পৃথক্ নানা অসভ্য দলের একত্র করণ। সেই সামান্য অসভ্য জাতির সাহায্যে আমমাংসলোভী, অতিবিক্রমশালী জাতিকে একেবারে উচ্ছিন্ন করা, শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্য। পরের চিত্তবৃত্তির উপর, পরের সাহায্যের উপর, লোকের শ্রদ্ধার উপর, তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। নিভৃত চিন্তা, নির্জ্জনে তারস্বরে বেদপাঠ, আচার্য্য নিকটে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, বর্ষে বর্ষে একবার নিজ পরিজন সমভিব্যাহারে অযোধ্যাসংলগ্ন শালতালবনে মৃগয়া প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্য করিয়াই, তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতা প্রভাবে আর্য্যবৈরী, প্রভূতবিক্রমশালী (যে বিক্রম বর্ণন জন্য আর্য্যমুনি আর্য্যদেবগণকে সেই জাতির দাসত্বে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন,) সেই জাতিকে একেবারে ভারতবর্ষ নিকটস্থ দ্বীপ হইতেও নির্মূল করিয়াছেন। আর্য্যসন্তানেরা তাঁহার সেই কীর্ত্তি মনে করিয়া, অদ্যাপি তাঁহাকে সপ্তমাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা করে। অদ্যাপি তাঁহার নাম মহান্ ঈশ্বর শব্দের প্রতিশব্দ। অদ্যাপি রামজি হিন্দুস্থানে একমেবা-দ্বিতীয়ং।

কিন্তু এই ত্রেতাবতার রামচন্দ্র মানবীয় উপায় অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য্য হয়েন। তাঁহার চরিত্র অসাধারণ, অলৌকিক নহে। মনুষ্য যে উপায় অবলম্বন করিয়া, পরের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। পরের সাহায্য না পাইলে, কখনই মহৎকার্য্য সুসাধিত হয় না, এবং অন্যে কর্ত্তার মনোভাবে সমভাবী না হইলে, প্রাণপণে সাহায্য করে না। আন্তরিক সাহায্য নহিলে, সাহায্যই নহে। এক ব্যক্তির মনোভাবে আর এক ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে সমভাবী কে করে? মন

ঢালিয়া দিয়া পান করিতে, কে বলে? কেবল রস অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, রস উদ্দীপন করিতে চায় কে? উদ্দীপনা। প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই, এই রামায়ণ চরে, দক্ষিণ বিজয় চরে, রাবণ বধ চরে, রাক্ষস ধ্বংস চরে, যাহাই নাম দিউন, এই স্থানে, প্রয়োজন, বিপদুদ্ধার, মহৎকার্য্য সাধন, এই সকল জল বায়ুর গুণে উদ্দীপনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। সে লতা বহু পল্লবিতা, ভূরিমনোহরকুসুমশোভিতা হইয়াছিল। সে ফুলের মালা এখনও রামায়ণের পাতে পাতে সাজান রহিয়াছে। রামায়ণ গ্রন্থ রামের সমকালিক। রামায়ণ কাব্য স্থানে স্থানে উদ্দীপনাপূর্ণ। রামোত্থা উদ্দীপনা লতা তাবৎ ভারত ব্যাপিয়াছিল, কবিগুরু বাল্মীকি তাহারি গুটিকত অক্ষয় কুসুম তুলিয়া গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই লতা কত দিন জীবিতা ছিল? তাহা কে বলিতে পারে। যে দেশে মৌনব্রতাবলম্বী মুনিগণকে দেবসদৃশ ভক্তি করে; সে দেশে উদ্দীপনা কত দিন জীবিতা থাকিবে? কিন্তু আমরা এ সময়ের কিছুই জানি না। রাবণ নিপাতকারী রাঘব বংশের, সেই সূর্য্য বংশের, প্রাদুর্ভাব কিসে হ্রস্ব হইয়া, চন্দ্র বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইল, তা কে বলিতে পারে? কিন্তু ভারত নদীতে আর সহস্রেক বৎসর এদিকে বাহিয়া আসিয়া, আমরা আর একটি বৃহৎ চর দেখিতে পাই। চর দেখিলেই আশা হয়। অবশ্য নানা তরুলতা আছে। হয় ত উদ্দীপনার লতা আছে। এ চরটি ভারতযুদ্ধ চর।

এই সময়ে বিস্তীর্ণ আর্য্যাবর্ত্তে নানা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যক্ষেত্রে সূত, মাগধ, বল্লব, গোপ, সূপকার প্রভৃতি নানা আগাছা পরগাছা জন্মিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী, নাগকন্যা, আভীরী প্রভৃতি কত জঙ্গলী লতা উদ্ভূতা হইয়াছে, আর্য্যক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে শক, খশ, দরদ, বাহ্লীক, চীন, যবন প্রভৃতি নানা অনার্য্য জাতি দিন দিন বিক্রম বিস্তার করিয়া, আপনাদের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। ভারত রাজ্য, খণ্ড রাজ্য, উপরাজ্য, মণ্ডল, ছত্র, নগর, গ্রাম বিভেদে একেবারে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। চোল, কেরল, চোর, মণ্ডল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মথুরা, ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, সৌরাষ্ট্র, মরুকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর প্রভৃতি নানা দেশ, নানা

রাজা। পরস্পরে একতা নাই, সৌহার্দ্দ্য নাই। এই সময়ে অষ্টম যমলাবতার কৃষ্ণার্জ্জুন জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিরবৈরী বেদদ্বেষী কংস-রাজকে বিনষ্ট করিয়া, যে জরাসন্ধ স্বীয় কারাগারে ভারতের বীরগণকে অন্ধকারে বিনষ্ট করিতেছিলেন, যে শিশুপাল স্বীয় দম্ভে ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য, যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ ভ্রাতার সাহায্য লইলেন। সেই পঞ্চ ভ্রাতা আবার আপনাদের চিরজ্ঞাতিশত্রু দুর্য্যোধনকর্তৃক তাড়িত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। স্বার্থে দুই বিভিন্ন রাজাকে একত্র করিল। শ্রীকৃষ্ণের অর্থ সুসাধিত হইল, কিন্তু তৎপরেই জাতিবৈরযুদ্ধে সমস্ত ভারত দুই দলে বিভক্ত হইল এবং কুরুক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম হইল। চূর্ণীকৃত ভারত অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য এক না হউক, দুই দল হইয়াছিল। এ গৃহবিবাদে আর কি মহৎ ফল ফলিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু অশ্বমেধ পর্ব্বের বর্ণনে বোধ হয় যে, সমস্ত সাম্রাজ্য একীকরণের চেষ্টা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই মহৎ কার্য্যের উদ্যমের কর্তৃগণকেও আমরা দেবত্বে অভি-ষিক্ত করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, অর্জ্জুন নরনারায়ণ। তাঁহার ভ্রাতৃগণ সকলেই দেবরূপী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা সমস্ত মহাভারত প্রণয়ণের সমকালিক বৃত্তান্ত। বেদব্যাসের গ্রন্থ মহাভারত, রামায়ণের ন্যায় সেই কালের উদ্দীপনা শক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহোদ্দীপক বেদব্যাসের গ্রন্থোক্ত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের লেখার একবার তুলনা করুন। ভারতোক্ত নায়িকা শকুন্তলার চরিতের সহিত নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের একবার তুলনা করুন। উভয়েই সতী সাধ্বী পতিব্রতা, মানবমোহিনী শক্তিতে ভূষিতা। উভয়েই আশৈশব মুনিগৃহে পালিতা, মাধবীলতার সহিত উভয়েই বর্দ্ধিতা, উটজপর্য্যন্তচারিণী হরিণী উভয়েরই সঙ্গিনী। উভয়কেই দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, আর বিস্মৃতি ক্রমেই হউক, বর্জন করিলেন, অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিলেন না, সহধর্ম্মিণী আখ্যা দিয়া মান বৃদ্ধি করিলেন না। কিন্তু এই আচরণে দেখুন,

কবির শকুন্তলা কিরূপ ব্যবহার করেন। কবির শকুন্তলা রাজার গোপন ব্যবহার দুইবার স্মরণ করিয়া দিতে গিয়া, পরে লজ্জাতে, ঘৃণাতে নিবারিত হইয়া, আপনার দুঃখ আপনিই প্রকাশ করিলেন।

যথা,—রাজা। আর্য্য কথ্যতাম্।

গৌত। ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ,
তুএবি ণ পুচ্ছিদো বন্ধূ।
এক্কক্কম্‌স্স চরিএ,
কিং ভণদু এক্ক একস্‌সিং॥

শকু। (আত্মগতম্) কিণ্ণু ক্খু অজ্জউত্তো ভণিস্‌সেদি ?

রাজা। (সাশঙ্কমাকর্ণ্য) অয়ে। কিমিদমুপন্যস্তং।

শকু। (আত্মগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! সাবলেবো সে বঅণাবক্খেবো!

* * * * *

রাজা। কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

শকু। (সবিষাদমাত্মগতম্) হিঅঅ সং পদং সংবুত্তা দে আসঙ্কা।

* * * * *

রাজা। ভো স্তপস্বিনশ্চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃস্মরামি তৎকথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষেত্রিয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।

শকু। (স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী। কধং পরিণএজ্জেব সন্দেহো ভগ্‌গা দাণিং দূরারোহিণী আসালদা।

* * * * *

শকু। (স্বগতম্) ইমং অবত্থন্তরং গদে তাদিসে অণুরাএ কিম্বা স্মুমরাবিদেণ, অধবা অত্তা দাণিং মে সোধণীও হোদুত্তি কিঞ্চি বদিস্‌সং। (প্রকাশম্) অজ্জউত্ত। (ইত্যর্দ্ধোক্তে) অধবা সংসইদো দাণিং এসো সমুদাচারো। পোরব! জুত্তং ণাম তুহ, পুরা অস্‌সমপদে সত্তাবুত্তাণহিঅঅং ইমংজণং তধাসমঅপুব্বঅং সম্ভাবিঅ সম্পদং ইদিসেহিং অক্খরেহিং

পচ্চক্খাদুং।

শকু। ভোদু জই পরমথদো পরপরিগ্গহসঙ্কিণা তুএ এব্বং পউত্তং তা অহিঞ্ঞাণেণ কেণবি তুহ আসঙ্কং অবণইস্সং।

রাজা। প্রথমঃ কল্পঃ।

শকু। (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য) হদ্দী হদ্দী! অঙ্গুলীঅসুণ্ণা মে অঙ্গুলী! (ইতি সবিষাদং গৌতমীমুখমীক্ষতে)

রাজা। (সস্মিতম্) ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।

শকু। এত্থ দাব বিহিণা দংসিদং পউত্তণং অবরং দে কধইস্সং।

রাজা। শ্রোতব্যমিদানীম্।

সকু। ণং এক্ক দিঅহে বেদসলদামণ্ডবে ণলীণীবত্তভাঅণগদং উদঅং তুহ হত্থে সণ্ণিহিদং আসী।

রাজা। শৃণুমস্তাবৎ।

শকু। তক্খণং সো মে পুত্তকিদও দীহাপঙ্গোণাম মিঅপোদত্ত উপট্ঠিদো, তদো তুএ অঅং দাব পড়মং পিঅদুত্তি অণুকম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উদএণ, ণ উণ সো অপরিচিদস্স দে হত্থাদো উদঅং উবগদো পাদুং, পচ্ছা তস্সিং জ্জেব উদএ মএ গহিদে কিদো তেণ পণও, এত্থন্তরে বিহসিঅ তুএ ভণিদং সব্বো সগন্ধে বীসসদি, জদো দুবেবি তুম্হে আরণ্ণকা অত্তি।

রাজা। আভিস্তাবদাত্মকার্য্যপ্রবর্ত্তিনীভির্মধুরাভিরনৃতবাগ্‌ভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।

গৌতমী। মহাভাঅ! ণারিহসি এব্বং মন্তিদুং, তবোবণসংবড্ঢিদো কখু অঅং জণো অণভিণ্ণোকইদবস্স।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে!

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীণাং, সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ। প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বি-

ঠৈজঃপরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি।

শকু। (সরোষম্) অণজ্জ। অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্‌খসি; কোণাম অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅপ্পবেসিণো তিণচ্ছণ্ণ-কূবোবমস্স তুহ অণুআরী ভবিস্সদি।

* * * * *

রাজা। ভদ্রে প্রথিতং দুষ্মন্তস্য চরিতং, প্রজাস্বপীদং ন দৃশ্যতে।

শকু। তুম্হে জ্জেব পমাণং,
জাণধ ধম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও
জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥
সুট্ঠু দাব অত্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিআ সমুবট্ঠিদা।

গৌতমী। জাদে ইমস্স পুরুবংসপচ্চয়েণ মুহমহুণো হিঅঅবিসস্স হত্থং সমুবগদাসি।

শকু। (পটান্তেন মুখমাচ্ছাদ্য রোদিতি।)

* * * * *

শার্ঙ্গরব। * * * গৌতমী গচ্ছাগ্রতঃ। (ইতিসর্ব্বে প্রস্থিতাঃ।)

শকু। অহংদাণিং ইমিণা কিদবেণ বিপ্পলদ্ধা, তুম্হেবি মংপরিচ্চঅধ। (ইত্যনুপ্রস্থিতা)

* * * * *

শার্ঙ্গ। (সরোষং প্রতিনিবৃত্য) আঃ পুরো ভাগিনি! কিমিদং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে।

শকু। (ভীতা বেপতে)

শার্ঙ্গ। শকুন্তলে! শৃণোতু ভবতী।
যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা ত্বমসি কিংপুনরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমং॥

পুরোধাঃ। (বিচার্য্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাং—।

রাজা। অনুশাস্তু মাং গুরুঃ।

পুরোধাঃ। অত্রভবতী তাবদাপ্রসবাদস্মদ্গৃহে তিষ্ঠতু।

রাজা। কুত ইদম্?

পুরো। ত্বং সাধুভির্নৈমিত্তিকৈরুপদিষ্টপূর্ব্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। সচেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি, বিপর্য্যয়েত্বস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং স্থিতমেব।

রাজা। যথা গুরুভ্যো রোচতে।

পুরো। (উত্থায়) বৎসে ইত ইতোঽনুগচ্ছ মাম্।

শকু। ভঅবদি বসুন্ধরে! দেহি মে অন্তরং। (ইতি সহ পুরোধসা গৌতমীতপস্বিভিশ্চ রুদতী নিষ্ক্রান্তা।)

---

* রাজা। আর্য্যে বলুন।

গৌত। এও গুরু জনের অপেক্ষা করে নাই, তুমিও বন্ধু জনকে জিজ্ঞাসা কর নাই। একলা একলার কার্য্যে অপরে কে কি বলিতে পারে?

শকু। (আত্মগত) না জানি আর্য্যপুত্র কি বলেন?

রাজা। (শুনিয়া সভয়) কি গা? উপন্যাস আরম্ভ করিলে নাকি?

শকু। (আত্মগতা) আ ছি ছি! এঁর বচনভঙ্গী যে কেমন কেমন।

* * * * *

রাজা। কি আমি এঁকে বিবাহ করিয়াছিলাম নাকি?

শকু। (সবিষাদ আত্মগতা) হা হৃদয়! যা ভয় করেছিলে, এখন তাই হলো!!

* * * * *

রাজা। হে তপস্বিগণ! ভাবিয়া চিন্তিয়াও ত ইহাকে পরিগ্রহ করা, আমি মনে করিতে পারিতেছি না। তবে কুক্ষত্রিয়ের ন্যায় কেমন করে, এই স্পষ্টগর্ভলক্ষণাকে গ্রহণ করি?

শকু। (আত্মগত) ছি ছি! বিবাহেতেই সন্দেহ! এত দিনে আমার দূরারোহিণী আশালতা ছিন্ন হইল।

ব্যাসের শকুন্তলা সে প্রকৃতির নহেন, তিনি দুষ্মন্তকর্তৃক পরিবর্জিতা হইয়া, ম্লান বদনে ছল ছল নয়নে, দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে আশাসকে বিসর্জ্জন দিয়া, প্রত্যাগমন করিবার মহিলা নহেন। তিনি লাঙ্গুলস্পৃষ্টা কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় মুখ ফিরাইয়া, গর্জন করিয়া উঠিলেন। গর্জন করিয়াই প্রত্যাবৃত্তা হইবেন? তাহা হইলে ত কবির সৃষ্টা বীর-রস-প্রবণা নায়িকা হইলেন মাত্র। তা নয়, তিনি উদ্দীপনাকে স্মরণ করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিজ মনোভাব তাঁহার কর্ণকুহর দিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বেগে ঢালিয়া দিলেন। তিনি সফলাও হইলেন।

---

* * * * *

শকু। যেমন অনুরাগই যদি এমন অবস্থান্তর গত হইল, তবে আর মনে পড়াইবার চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? তথাপি আপনাকে দোষমুক্ত করিবার জন্য কিছু বলি। (প্রকাশে) আর্য্যপুত্র। (এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া) অথবা এখন এ সম্বোধন যুক্ত হইতেছে না।

পৌরব! পূর্ব্বে আশ্রমপদে প্রণয়-প্রফুল্ল-হৃদয়া আমাকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আদর করিয়া, এখন এইরূপে প্রত্যাখ্যান করা কি, তোমার উপযুক্ত?

* * * * *

শকু। ভাল যদি যথার্থই পরস্ত্রীগ্রহণ শঙ্কা করিয়া, তুমি এরূপ করিতেছ, তবে আমি কোন অভিজ্ঞান দ্বারা তোমার আশঙ্কা দূর করি।

রাজা। উত্তম কথা।

শকু। (অঙ্গুলি দেখিয়া) হায় হায়। অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় নাই যে। (সবিষাদ গৌতমীর মুখ দর্শন।)

রাজা। (হাস্য করিয়া) একেই বলে, স্ত্রীদিগের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

শকু। এস্থলে এখন বিধাতাই প্রভুত্ব দেখাইলেন, ভাল আমি তোমাকে আর কিছু বলিতেছি।

রাজা। বল শুনিতেছি।

শকু। এক দিন বেতসলতামণ্ডপে তোমার হস্তে পদ্মপত্রে জল ছিল?

রাজা। তার পর বল শুনি।

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি ॥
মেনকা ত্রিদশেষেব ত্রিদশাশ্চানুমেনকাম্।
মত্তৈবোদ্রিচ্যতে জন্ম দুষ্মন্ত তব জন্মতঃ ॥

শকু। সেই সময়ে সেই দীর্ঘাপাঙ্গ নামে আমার কৃতপুত্র মৃগশাবক আসিল? এই "আগে পান করুক," এই বলিয়া তুমি আদর করিয়া, তাহাকে জলপান করিতে ডাকিলে; কিন্তু সে অপরিচিত বলিয়া, তোমার হস্ত হইতে জল খাইতে আসিল না। তার পর আমি সেই জল লইলে, সে ভাল বাসিয়া খাইল। তাহাতে তুমি হাসিয়া বলিলে, "সকলেই সজাতিকে বিশ্বাস করে।" তোমরা দুজনেই বন্য।

রাজা। স্ত্রীলোকে আপন কার্য্য সাধন জন্য এইরূপ অমৃতমধুর মিথ্যা বচন দ্বারাই বিষয়ী লোকদিগকে আকর্ষণ করে।

গৌত। মহারাজ! এরূপ মনে করিবেন না। তপোবনে পালিত এই সকল লোকেরা কৈতব জানে না।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে! পশু পক্ষীর মধ্যেও স্ত্রীজাতির অশিক্ষিতপটুত্ব দেখা যায়, তবে পরিবোধবতীদিগের কথা আর কি বলিব? দেখ, কোকিলাগণ শাবকেরা আকাশে উড়িতে পারিবার পূর্ব্বে আপনারা তাহাদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া লয়।

শকু। অনার্য্য! এ কি আপনার হৃদয় অনুমানে সকলকে দেখিতেছ নাকি? তুমি ধর্ম্মচ্ছদ্মবেশী, তৃণাচ্ছাদিত কূপের মত। অন্যে কে তোমার অনুকরণ করিবে?

রাজা। ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র প্রসিদ্ধ; আমার প্রজাদের মধ্যেও এমত দেখা যায় না।

শকু। তোমাদের কথাই প্রমাণ, লোকের ধর্ম্মস্থিতিও তোমরা জান, লজ্জাজিতা মহিলারা কিছুই জানে না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকা হইয়া, আসিয়াছি?

গোত। বাছা পুরুবংশে বিশ্বাস করিয়া মধুমুখ গরলহৃদয় জনের হাতে পড়েছ।

শকু। (মুখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)

ক্ষিতাবটসি রাজেন্দ্র অন্তরীক্ষে চরাম্যহং।
আবয়োরন্তরং পশ্য মেরুসর্ষপয়োরিব ॥
মহেন্দ্রস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
ভবনান্যনুসংযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ ॥
সত্যশ্চাপি প্রবাদোঽয়ং যং প্রবক্ষ্যামি তে হনঘ।
নিদর্শনার্থং ন দ্বেষাৎ শ্রুত্বা তং ক্ষন্তুমর্হসি ॥
বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখং।
মন্যতে তাবদাত্মানং অন্যেভ্যো রূপবত্তরং ॥

---

* * * * *

[illegible] হউন, (সকলে যাইতে লাগিলেন)

শকু। [illegible] এই শঠ আমায় ত্যাগ করিল, তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিবে? (এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন।)

শার্ঙ্গ। (ক্রোধে ফিরিয়া) দুষ্টশীলে। স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিতেছিস্।

শকু। (ভয়ে কম্পান্বিতা।)

শার। শকুন্তলে। তুমি শুন, রাজা যাহা বলিতেছেন, তাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি কুলটা, তোমায় লইয়া কি হইবে? আর যদি আপনাকে তুমি শুচিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে পতিগৃহে দাস্যবৃত্তিও তোমার ভাল।

পুরোধা। (চিন্তা করিয়া) যদি এরূপ করেন—

রাজা। মহাশয় উপদেশ দিন।

পুরোধা। ইনি প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে থাকুন।

রাজা। কেন?

পুরোধা। সাধুনৈমিত্তিকেরা বলিয়াছেন, যে আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবে। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহাকে সমাদরে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, তা যদি না হয়, তবে ইহার বাপের বাড়ী যাওয়াই স্থির।

রাজা। গুরুর যাহা অভিরুচি।

পুরো। (উঠিয়া) বাছা আমার সঙ্গে এই দিকে আইস।

শকু। ভগবতি বসুন্ধরে! আমাকে অন্তরে স্থান দেও। (পুরোধা ও গৌতমীর সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে নিষ্ক্রান্তা।)

যদা তু মুখমাদর্শে বিকৃতং সোঽভিবীক্ষতে।
তদেতরং বিজানাতি আত্মানং নেতরং জনং॥
অতীব রূপসম্পন্নো ন কিঞ্চিদবমন্যতে।
অতীব জল্পন্ দুর্ব্বাচো ভবতীহ বিহেঠকঃ॥
মূর্খো হি জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ॥
প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ॥
অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যান্ হৃষ্টো ভবতি দুর্জনঃ॥
অভিবাদ্য যথা বৃদ্ধান্ সন্তো গচ্ছন্তি নির্বৃতিং।
এবং সজ্জনমাক্রুশ্য মূর্খো ভবতি নির্বৃতঃ॥
সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মূর্খা দোষানুদর্শিনঃ।
যত্র বাচ্যাঃ পরৈঃ সন্তঃ পরানাহুস্তথাবিধান্॥
ততো হাস্যতরং লোকে কিঞ্চিদন্যন্নবিদ্যতে।
যত্র দুর্জন ইত্যাহ দুর্জনঃ সজ্জনং স্বয়ং॥
সত্যধর্ম্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
অনাস্তিকোঽপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ॥
স্বয়মুৎপাদ্য বৈ পুত্রং সদৃশং যো ন মন্যতে।
তস্য দেবাঃ শ্রিয়ং ঘ্নন্তি ন স লোকানুপাশ্নুতে॥
কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমব্রুবন্।
উত্তমং সর্ব্বধর্ম্মাণাং তস্মাৎ পুত্রং ন সংত্যজেৎ॥
স্বপত্নীপ্রভবান্ পঞ্চ লব্ধান্ ক্রীতান্ বিবর্দ্ধিতান্।
কৃতানন্যাসু চোৎপন্নান্ পুত্রান্ বৈ মনুরব্রবীৎ॥
ধর্ম্মকীর্ত্ত্যাবহা নৃণাং মনঃ সংপ্রীতিবর্দ্ধনাঃ।
ত্রায়ন্তে নরকাজ্জাতাঃ পুত্রা ধর্ম্মপ্লবাঃ পিতৄন্॥
স ত্বং নৃপতিশার্দ্দূল পুত্রং ন ত্যক্তুমর্হসি।

আত্মানং সত্য ধর্ম্মৌ চ পালয়ন্ পৃথিবীপতে ॥
নরেন্দ্রসিংহ কপটং ন বোঢ়ুং ত্বমিহার্হসি ।
বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ ॥
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরং ।
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং ॥
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ।
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং ॥
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বা স্যান্নবা সমং ।
নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং ॥
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ।
রাজন্ সত্যং পরংব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ ॥
মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যং সঙ্গতমস্তু তে ।
অনৃতে চেৎ প্রসঙ্গস্তে শ্রদ্দধাসি নচেৎ স্বয়ং ॥
আত্মনা হন্ত গচ্ছামি ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতং ।
ত্বামৃতেপি হি দুষ্মন্ত শৈলরাজাবতংসিকাং ।
চতুরন্তামিমামুর্ব্বীং পুত্রোমে পালয়িষ্যতি ॥

মহাভারতে আদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে শকুন্তলোপাখ্যানে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে ।*

---

* মহারাজ সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্বপরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাও না ? মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরণীয়া, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি । অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও সর্ষপের প্রভেদের ন্যায় । আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি । হে মহারাজ ! আমি এস্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখিতেছি, শ্রবণ কর, রুষ্ট হইও না । দেখ কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে, ততক্ষণ আপ

এইরূপ জ্বলন্ত উদ্দীপনা মহাভারতের নানা স্থানে আছে। এখা নেও যেখন প্রয়োজন হইয়াছিল। জরাসন্ধের কারাগার হইতে ভারতের বীরগণকে উদ্ধার করা, ভারতের সীমান্তপ্রদেশে নূতন দ্বারকানগর স্থাপন করা, একবার রাজসূয়যজ্ঞকালে সমস্ত ভারতের মিলন, আবার কুরুক্ষেত্রে

নাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে। কিন্তু যখন আপনার মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপের প্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্য ব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে; সেইরূপ মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে, শুভ কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন; কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধুব্যক্তিরা মান্যলোদিগকে সম্বর্দ্ধন করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে; কারণ অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও, তাহার নিন্দা করে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধ কালসর্পরূপী সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আস্তিকেরা কোথায় আছে। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন, এবং সে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বধর্ম্মোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত, এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালের ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে, এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ। তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরাপতে, আত্মকৃত সত্যধর্ম্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ শত শত কূপ খনন অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ; শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা

সেই সমস্ত ভারতের সসৈন্যপর্য্যটন ও বল পরীক্ষা, শেষে অশ্বমেধ উদ্দেশে সমস্ত ভারত বিজয় করা প্রভৃতি নানা মহৎকার্য্য সাধন, প্রয়োজন। যেখানে বহুলোকের প্রবৃত্তিচালন প্রয়োজন, সেইখানেই উদ্দীপনার আবশ্যক, এবং প্রয়োজনই প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রসূতি। তৎকালিক উদ্দীপনা তৎকালিক মহাকাব্য গ্রন্থে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। ভারতপল্লবিতা উদ্দীপনা লতার পুষ্প ভারত গ্রন্থে রাশি রাশি রহিয়াছে;—শকুন্তলোপাখ্যানে, নলোপাখ্যানে, ভীষ্মের বচনে, ভীমের ভর্ৎসনে, খাণ্ডবদাহনে, দ্রৌপদীর রোদনে, ভূরি ভূরি রচনে, সেই পুষ্প, এবার মালার মত নয়, স্তূপে স্তূপে রাশীকৃত রহিয়াছে। মহাভারতের পর্ব্বে পর্ব্বে রস। কবিতার রস, উদ্দীপনার রস, দুই রস সমভাবে থাকাতে, মহাভারত এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই ইহাকে মহাপুরাণ বলে, পঞ্চমবেদ বলে।

এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা এক পুত্র উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ; এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ! সমুদায় বেদ অধ্যায়ন ও সর্ব্ব তীর্থে অবগাহন করিলে, সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম, সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুরাগী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনিই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না, কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে এই পুত্র এই গিরিরাজবিরাজিতা সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, সন্দেহ নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত,

১ম খণ্ড, ১২৪—১২৬,

অতি প্রবল ঝড়ের পর স্বভাব অত্যন্ত শান্তভাব ধারণ করে। দুষ্ট ছেলে গুলি খানিক ক্ষণ মাতামাতি করিয়া, প্রায়ই মায়ের কোলে গিয়া অকাতরে অগাধ নিদ্রা যায়। অতি আয়াসসাধ্য কার্য্য করিলে পরই, একটু বিশ্রাম করিতে হয়। পর্ব্বাহে, পূজায়, উৎসবে, ব্রতনিয়মে, নাম-সংকীর্ত্তনে, চান্দ্র আশ্বিন, চান্দ্র কার্ত্তিক যাপিত করিয়া, বঙ্গ সমাজ একবার চান্দ্র অগ্রহায়ণ, চান্দ্র পৌষ বিশ্রাম করেন। মহরমে দুইপ্রহরে মাতনের পর দিন, জিরেন। ইহুদি বিবরণে এমন কি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকেও ছয় দিন জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া, রবিবারে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। ভারত ঘটনার পর হিন্দু সমাজ যে দিনকত বিশ্রাম করিবে, তার আর বৈচিত্র কি? একে প্রাচীন কালের হিন্দুসমাজ, তাহাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। হিন্দু জাতি অদ্যাপি সেই ভয়ানক ব্যাপার স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। আজ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর হইল, এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও পাঁচজনকে একত্র হইয়া, গোলমাল করিতে দেখিলে বলিয়া থাকি, ওখানে ভারি "কুরুক্ষেত্র" হইতেছে। এই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারে বহু সংখ্যক সৈন্য নাশ হইয়া গেল এখন যে হিন্দু সমাজ কতকাল নিদ্রা যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যে হিন্দু জাতি, কাষ্ঠ আহরণকারী ছেদকের শিরেও নিপীড্যমান বৃক্ষ, ছায়া দান করিতে বিরত হয় না, ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল বলিয়া অদ্যাপি উপরতস্পৃহতার উদাহরণ কথায় কথায় দেয়, যে হিন্দু জাতি দৌড়ান চেয়ে দাঁড়ান ভাল, দাঁড়ান অপেক্ষা বসা ভাল, বসা চেয়ে শোয়া ভাল, শোয়া চেয়ে ঘুমান ভাল, ইত্যাদি ধারাবাহিক বচন নিচয় সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের আলস্য পরতন্ত্রতার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় প্রদান করিয়াছে, যে হিন্দুজাতি পৌরাণিক শাসন প্রমাণ বিবৃতি জন্য, কেহ বাল্যক্রীড়াকালে কৌতুকপ্রিয়তা বশতঃ শলভপুচ্ছে শলাকা প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, তাহার শত জন্ম পরে শত পুত্রের মৃত্যু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া, নিষ্ঠুরতার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং অতিশয় গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি অতি সামান্য রক্তপাতকে

মহাপাপী বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই হিন্দু জাতি এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিল। ভারত বীর্য্যহীন, ভারত বীর শূন্য, কুরুবংশ লুপ্তপ্রায়, যদুবংশ লুপ্ত, গৃহ বিচ্ছেদে গৃহ দগ্ধ। নির্জীব ভারত ঘুমাইতে লাগিল। সহস্র বর্ষ এইরূপ নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। পরশুরাম একবিংশতিবার চেষ্টা করিয়া যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয়েরা গৃহ বিবাদে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিল। পৃথিবী প্রায় নিঃক্ষত্রিয়া। নিঃক্ষত্রিয় ভারতে ব্রাহ্মণেরা একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। এখন আর ব্রাহ্মণগণ কেবল হোতাপোতা, দীক্ষা-শিক্ষা দাতা, শাস্ত্র প্রণেতা নহেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকল কার্য্যেই হস্তার্পণ করিলেন তাঁহারাই এখন সমাজের কর্ত্তা, তাঁহারাই এখন শাসন বিধাতা। সে কঠোর শাসনভারও আমরা এখন মনঃক্ষেত্রে চিত্রিত করিতে পারি না। নিঃক্ষত্রিয়, ক্লান্ত ভারত সেই কঠোর শাসনে অবসন্ন হইয়া রহিল।

হিন্দু সমাজ পূর্ব্ব হইতেই যন্ত্রবৎস্থায় চলিতেছিল। এখন সেই সমাজের একদল পৃথক্ হইয়া যন্ত্রচালক হইল। বিপ্রবর্গ যন্ত্রচালকের কর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়া, কেবল যন্ত্রচালনাতেই সময় যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের সেই শান্তভাব, সেই বিশুদ্ধভাব, একটু অপূর্ব্ব পারলৌকিকভাব, ঐহিক চিন্তা অবিচলিত ভাব হারাইলেন। কলচালনেই ব্যস্ত, কঠোর নিয়ম সমস্ত প্রচার করিলেন। ছায়াবাজীর পুতুলের যে স্বাধীনতা আছে, হিন্দু সমাজের সে স্বাধীনতাটুকুও রহিল না। ছায়াবাজীর পুতুলের আকর্ষণী রজ্জু ক্ষণমাত্রের জন্যও ছিন্ন হইলে, পুতুল তখন আর চালকের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ শাসন, এ ব্যবস্থা এমনি সুকৌশলযুক্ত, যে যদি একটার আকর্ষণী রজ্জু ছিঁড়িল, আর একটা আনিয়া তাহা বাঁধিয়া দিল।

প্রত্যেক দিনের রাত্রের শেষ ছয় দণ্ড হইতে পরদিন রাত্রি প্রহরেক পর্য্যন্ত এক নিয়ম; প্রত্যেক চান্দ্র মাসের অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা, পূর্ণিমা হইতে চতুর্দ্দশী তিথি নিয়ম, সপ্তাহের প্রত্যেক বারের এই এই ক্রিয়া; সূর্য্য-সংক্রমণে এই নিয়ম, উত্তরায়ণে এই, দক্ষিণায়নে এই; বিশেষ

চক্রাসনে এই, শব নানা প্রকার, বর্ণাশ্রমে এইরূপ, মাতৃগর্ভে অঙ্কুর-স্থাপন অবধি, শবদাহের পর পর্য্যন্ত একাদশাহ পর্য্যন্ত, উক্ত মানবজীবন নয়, মানবজীবনের মাথার একটা চূড়া, পায়ে খড়ম, এই আগা পিছা বাঁধন মানবজীবনে এই এই সংস্কার, এই এই ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ ... গুরুনিন্দি, দৈনিক কর্ম্ম, প্রীতি গ্রহণের পদ্ধতি প্রীতিকালে এই কার্য্য হইবে, এই গুলি দেশাচার, এই গুলি কুলাচার, এইটি এই বংশের রীতি, এটা গোত্রের পদ্ধতি, এ শাখার এইটা ধর্ম্মশাস্ত্র, এইরূপে জন্ম লইতে হবে, এই ভাবে জন্ম দিতে হবে। এই প্রকার বাঁধিতে হবে, এইরূপে মরিতে হবে, এটী খাবে, এটী খাবে না, এখানে এই ভাবে বসিবে, এতক্ষণ ধ্যান করিবে। হিন্দু শাস্ত্র পালনের জন্য হিন্দু সমাজ, হিন্দু সমাজের রক্ষা বা উন্নতির জন্য হিন্দু শাস্ত্র নহে। তোমার প্রত্যহ পঞ্চ অতিথি ব্রাহ্মণ সেবা করা কর্ত্তব্য, তুমি চারি জনের অধিকের সেবা করিতে পারিলে না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত সাধীপূর্ণি মাতে পাঁচটী বৃষাবধবা বৎস, পঞ্চ ব্রাহ্মণে দান কর। পাঁচটী বৎসই বৃষাবধবা হয় নাই উত্তম, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত শতৈকবার গায়ত্রী জপ করিবা, অষ্টোত্তর শত নিষ্ক ব্রাহ্মণে দান। গায়ত্রীজপকালে ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে, বেশ, ইহার প্রায়শ্চিত্ত ত্র্যহ উপবাসপূর্ব্বক গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া অষ্টাবিংশ সাত্ত্বিক বিপ্রে শুভ্র বস্ত্র দান, গোদাবরী স্নানকালে জীবিত শঙ্খ কর্কটে তোমার পদ স্পর্শ করিয়াছে, ভাল ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণাবর্ত্তে অষ্টাশীতি ব্রাহ্মণ ভোজন। ২৩ নম্বরের পুতুলের দক্ষিণ হস্তের তার ছিঁড়িয়া গেল, ৫১ নম্বরের পুতুল আসিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। সে বাঁধিতেছে, তাহার ঘর্ম্ম হইতেছে, ১৬৪ সংখ্যার পুতুল বাতাস করিতেছে, ৩ নম্বরের পুত্তলিকা সেই বাতাস ঠিক ভাবে হইতেছে কি না, তাহাই দেখিতেছিল, ঐ ২৩ নম্বরের হাতের তার বাঁধা হইবামাত্র তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল। এইরূপে ঋষিদিগের, শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের কাল্পনিক পাথরের উপর পাথরে এক বৃহৎ মায়াময় অট্টালিকা হইল। উপবাসে, জপে, জাগরণে, নিত্য কর্ম্ম পালনে, কঠোর শাসনে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। যাজনক্রিয়ার একাধিকারী ব্রাহ্মণ জাতির উপর সাধারণের দিন

দিন অশ্রদ্ধা হইতে লাগিল। বিপ্রজাতির মধ্যবর্ত্তিতা অবহেলা করিয়া, লোকে যে ভক্তিতে ভগবানকে ভজিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবে, তাহারও উপায় ছিল না। শাস্ত্রবিচ্যুত জাতিদিগকে স্পর্শন বা শুদ্ধ দর্শন করিলেও মহাপাপ, এই সংস্কার অনেকের মনে হওয়াতে তাহারা ঘৃণিত হইয়া, কদর্য্য বিষাক্ত সরীসৃপের ন্যায়, ধরণীবিবরে, পর্ব্বতগহ্বরে, বাস করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণগণ শাসনরজ্জু ক্রমেই পেঁচাও করিয়া, অসংখ্য ফাঁশ, লোকের গলে, বক্ষে, হস্তপদে, করাঙ্গুলিতে, পদাঙ্গুলিতে দিয়া দুজনে দুজনে ফাঁশ জড়াইয়া, দশ জনে দশ জনে ফাঁশ জড়াইয়া, জাতিতে জাতিতে ফাঁশ জড়াইয়া, সমস্ত হিন্দু সমাজ এক বড় ফাঁশে জড়াইয়া, রজ্জুর দুই মুখ একত্র করিয়া, আপনারা ধরিয়া বসিয়া, কেবল দড়ি পাকাইতে লাগিলেন, একটু টান পড়ে, আর তৈয়ারি দড়ি গেরো দিয়ে বাড়াইয়া দেন। কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের একে বিশ্রামপ্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাতে দৃঢ় নিয়মবিষ সমাজের শাখায়, পাতায়, শিরে শিরে, প্রবেশ করিয়া, লোকের মস্তকে, মস্তিষ্কে, কেশে, অস্থির মধ্যগত মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া, সব একবারে জ্বর জ্বর করিয়া রাখিল।

এই সময়ে নবমাবতার বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে ঐ সমস্ত বিপদ জঞ্জাল দূরীকরণ করিতে হইবে। এক এক গাছি করিয়া তার ছিঁড়িলে এ কার্য্য হইবে না। আর একজন আসিয়া বাঁধিয়া দিবে, অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী দড়ি একবারে ছিঁড়া চাই। ফাঁশের দড়িতে একটু একটু করিয়া টান্, দিলে ত হইবে না। মাজখানে এমন একটি আঘাত করা চাই, যে সেই আঘাতে লোক এমন বেগে ছড়াইয়া পড়িবে, যে ব্রাহ্মণের হাত হইতে বাঁধনের দুই মুখ খুলিয়া যাইবে, সে মুখ তাঁহারা আর ধরিতেও পারিবেন না, এবং নূতন দড়ি পাকাইয়া, জোড়া দিয়াও, আর বাঁধিবাঁধিতে পারিবেন না।

বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন, তিনি এক বিরাট আঘাতে সমস্ত তার খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন, তিনি এই অবসন্ন, দিন দিন জড়ীভূত সমাজ কেন্দ্রে এমনি একটী গুরুতর কেন্দ্রবিয়োজক বল প্রয়োগ করিলেন, যে

ব্রাহ্মণদের কঠোর শাসন একেবারেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই বেগ প্রাচীন হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়াই, পর্য্যবসিত হইল না, ভারত সাগরের ঊর্ম্মিসঙ্কুল নীরজরাশি তাহার গতি রোধ করিতে পারিল না, হিমালয়ের তুষারাবৃত তুঙ্গশিখরশ্রেণী সেই বেগের প্রতিবন্ধক হইতে পারিল না। বাহ্লীক, খোতন, তিব্বৎ, তাতার, চীন, মহাচীনে, ব্রহ্ম, শ্যাম, মলয়ক, কোচীনে; যব, বলি, সুমাত্রা, সিংহলদ্বীপে সেই বেগ চালিত হইল। সমস্ত পূর্ব্ব আসিয়া জীবিত হইল। নববর্ষের মধ্যে পঞ্চবর্ষ নবভাব ধারণ করিল। শাক্য মুনি ব্রাহ্মণদিগের সেই পাষাণময় অট্টালিকা চূর্ণীকৃত ও ভূমিসাৎ করিয়াই, ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি সেই চূর্ণীকৃত অট্টালিকার উপকরণ লইয়া, একটি অপূর্ব্ব সুদৃশ্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি রবসপিয়ারের ন্যায় হিন্দু সমাজকে একেবারে অধঃপাতে দিয়া, অতলে ডুবাইয়া, গভীর রসাতলে সমাজের সমস্ত কলঙ্ক কচলাইয়া ধুইয়া, সেইখানে তাহার দোষ ক্ষালন করিয়া, আবার নেপোলিয়নের ন্যায় হিন্দু সমাজকে উন্নত পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সামান্য কথায় বলে, ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু গড়া কঠিন। বাস্তবিক ভাঙ্গা তত সহজ নহে; ভাল পাকা মজবুদ গাঁথনি ভাঙ্গা অত্যন্ত কষ্টকর, অতীব আয়াসসাধ্য এবং সময়ে সময়ে হয়ত একেবারেই দুঃসাধ্য। অতি কাঁচা গাঁথনি ভাঙ্গা আবার যেমন সহজ, তেমনি বিপদ পরিপূর্ণ, অনেকে ভাঙ্গিতে গিয়া, চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। আবার এমন গাঁথনি আছে যে, খানিক অত্যন্ত শিথিল, খানিক অত্যন্ত দৃঢ় বদ্ধ। সে গুলি ভাঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। শাক্য সিংহ হিন্দু সমাজের গাঁথনি যেমন ভাঙ্গিয়াছিলেন, অচিরাৎ তেমনি একটী পাকা গাঁথনির সুবৃহৎ সমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যটী যেমন সুমহৎ, তেমনি সুকঠিন। সিদ্ধার্থ উদ্দীপনার সাহায্যেই সমাজ সংস্করণে সফলার্থ হয়েন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে আমরা তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। তিনি ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থান পর্য্যটন করেন, সকল স্থানই তাঁহার উদ্দীপনাতে মাতিয়া উঠে। শাক্য সিংহ মগধরাজ অজাতশত্রু, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও কাশীরাজ এই তিন জন অতি প্রতাপশালী নরপতিকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী

করেন। তিনি বায়াত্তর বয়ঃপ্রাপ্তি কয়েক বৎসর ক্রমাগত স্বীয় মত বিস্তার করেন। তিনি এক জীবনে লক্ষ লক্ষ লোককে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া, লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। আর্য্যধর্ম্মধ্বংসকারী নিজ অসীম ক্ষমতা বলে পৌরাণিক অবতার হইলেন। পৃথিবীর (ক) অর্দ্ধেক লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে।

অদ্যাপি পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ লোক তাঁহাকে ফো, বোধ, গডামা, মহৎ লামা, বুদ্ধ প্রভৃতি নানা অভিধানে ঈশ্বরত্বে অভিষিক্ত রাখিয়াছে। অদ্যাপি হিন্দুরা তাঁহাকে নবমাবতার জানিয়া ভক্তি করিতেছে। অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রে তিনিই জগন্নাথ মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিয়া, ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুয়ানির সারস্বরূপ জাতিভেদ সংঘটিত অন্নবিচার লোপ করিয়া, হিন্দুয়ানির সার হরণ করিতেছেন। অদ্যাপি তৎপ্রচারিত ধর্ম্মপদ কঠোর নাস্তিকের পর্য্যন্ত হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে দুজন অমানুষ মানুষের নাম করিতে হইলে, যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে তাহারি নাম করিতে হয়।

আর্য্যচরিত এতদূর পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া, আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে ভারতবর্ষে উদ্দীপনা মহাসাগরে চরের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তিন সহস্র বৎসর মধ্যে আমরা উদ্দীপনা বিপ্লাবিত হইতে তিনবার দেখিয়াছি মাত্র। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বন্যা বহাইয়া ছিলেন, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে মৌদ্গল্যায়ন, সারিপুত্র প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া, হিমালয় প্রদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছিলেন। নানা বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহাদের উপদেশ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

শাক্য সিংহের মৃত্যুর পর সহস্র বৎসর ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। ভারতসৌভাগ্য, চতুষ্পাদ পরিমিত হইয়াছিল। সে সৌভাগ্যসূর্য্য

(ক) পৃথিবীর লোক সংখ্যা ১০০ ধরিলে, প্রায় ১৬জন হিন্দু ও ৩২ জন বৌদ্ধ হয়, সুতরাং ১০০ র মধ্যে ৪৮জন বুদ্ধের দেবত্ব স্বীকার করে।

কি রূপে অস্তগত হয়, পশ্চাৎ দিগ্বিজয়ে আমাদের কত ক্ষতি হইয়াছে, কতক বা লাভ হইয়াছে, তাহা বর্ণন করা এ প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না, ইহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মহাসাগর যেমন জলময়, ভারত তেমনি কবিতাময়। মহাসাগরে দ্বীপ আছে, ভারতেও সেইরূপ উদ্দীপনা ছিল। এক্ষণে প্রবন্ধের সার কথা গুলি সংক্ষেপভাবে প্রদর্শন করিয়া, এবং কোন মহাত্মা যদি এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, উপসংহার করিতেছি।

আমাদের কি ছিল না, তাহা দেখা উচিত। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না। যদ্দ্বারা পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন করা, বা অন্যেকে কার্য্যে লওয়ান যায়, তাহাকে উদ্দীপনা শক্তি বলে। উদ্দীপনা কবিতা হইতে পৃথক্। কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা অন্যোদ্দিষ্টা রসাত্মিকা কথা। নির্জ্জনে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি, অন্য লোকের সহিত আলাপেই উদ্দীপনার জন্ম হয়। ভাল থাকিলেই মন্দ আছে; নির্জ্জনে চিন্তায় অধিক কবিতা হইল; উদ্দীপনা অতি অল্পমাত্র হইল, তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃসন্তুষ্ট জাতি, ভারতের সমাজভাগ ভূগোল ভাগের মত। ভারতবর্ষীয়ের জীবন, স্রোতের ন্যায়, আবার তাহাতে স্বভাবজ কোন পদার্থেরই অভাব নাই। কাহারও বিশেষ সাহায্যের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? অভাব না থাকিলেও, মানুষ কবি হইতে পারে, সাধারণ সুখ দুঃখ বোধ থাকিলেই কবি। কিন্তু উদ্দীপনা বিশেষ ঘটনায় বিশেষ রূপে পরিবর্দ্ধিতা হয়। প্রাচীন ভারতে তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে আমরা (দ্বীপের ন্যায়) উদ্দীপনাপ্রবল কাল তিনবার মাত্র দেখিতে পাই। এত বিস্তৃত ভাবে পুরাবৃত্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জল বায়ুতে উদ্দীপনালতা বর্দ্ধিতা হইয়াছিল, তাহা না জানিলে আমরা কখনই উদ্দীপনারোপণী কৃষিবৃত্তিতে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। সেই উদ্দীপনা রোপণ করাও এ সময়ে বিশেষ আবশ্যক।

গ্রাবু।

জলতলে একটী মৃৎপিণ্ড বিক্ষিপ্ত হইলে, সমকেন্দ্রী বীচিচক্র খেলিতে থাকে। চক্রের পরিধি ক্রমেই আয়ত হয়, কিন্তু তরঙ্গ বেগের ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে; দূরে ক্রমে মিশাইয়া যায়। কিন্তু প্রবাস চিন্তা-বেগের ভিন্ন ধর্ম্ম; পরিবারের মধ্যে থাকিলে যে সামান্য বিপদের অনুপাত একেবারে গ্রাহ্যই করিতাম না, প্রবাসে দেখ সেই অশুভ সংবাদজনিত চিন্তার বেগ কত বিক্রম সংগ্রহ করিয়াছে। বাস হইতে প্রবাস যতদূর হইবে, তোমার হৃদয় কন্দরস্থ ভাবনাপিণ্ড ততই বেগ তাড়িত প্রতি তাড়িত হইয়া দুলিতে, চলিতে, উঠিতে, পড়িতে, ডুবিতে, ভাসিতে থাকিবে। আবার আকর্ষণী শক্তিবলে গৃহাভিমুখে ধাবিত হও, ভাল বাসার কেন্দ্রের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, তরঙ্গের বেগ ততই বাড়িতে থাকিবে। প্রবাসে একদিন এইরূপ দুর্ভাবনায় আলোড়িত হইতে ছিলাম। চাঞ্চল্য নিবারণ জন্য, হে কাগজাবতার তাস! আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছিলাম। তুমি নানারূপে আমার নয়ন তৃপ্ত করিয়া, আমার মনকে ভুলাইয়াছিলে। মন তখন তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার তান্ত্রিক পূজার জন্য মানসিক উপকরণ আহরণ করিতেছিল। কখন বা ধূপদীপ নৈবেদ্য, রাশি রাশি গন্ধ পুষ্প, উৎসর্গ করিতে ব্যস্ত ছিল; কখন বা মনোমহিনী প্রতিমা সম্মুখে ক্ষুদ্র দীপমালা জ্বালনে অভিনিবিষ্ট ছিল; কখন বা বলিদান অবসানে মন সদ্যঃ নিঃসৃত শোণিত পরিব্যাপ্ত প্রাঙ্গণে ঘোর রোল সমুত্থানকারী ঢক্কারবে প্রোৎসাহিত হইয়া সমারোহ মধ্যে ভয়ানক ভাবে নৃত্য করিতেছিল। কখন বা নিরঞ্জনান্তে আর্দ্রবস্ত্রে পূর্ণঘট মস্তকে ধারণ করিয়া, আবার কবে ষষ্ঠী সপ্তমী আসিবে ভাবিতে ভাবিতে মগ্ন, মনে মনে ক্রন্দন করিতেছিল। হে কাগজাবতার! দ্বিপঞ্চাশদবয়বী তুমিই তখন মনকে সেই ভয়ানক তান্ত্রিক পূজা হইতে ক্রমে বিরত করিয়া ছিলে। তুমি ধন্য! তুমি আমার যথার্থ উপকার করিয়াছিলে; আমি

তোমার সেই উপকার স্বীকার জন্য আজ মুক্তকলমে তোমার মহিমা বর্ণন করিব।

হে স্বপৃষ্ঠস্বচিত্রচারুচৌকোণরূপধারিন্! তুমি, আমাকে যে মনোপূজা হইতে বিরত করিয়াছিলে, তাহারি কৃতজ্ঞতা স্বীকার জন্য আমি তোমার গুণগান করিব। আমি সামান্য পৌত্তলিকদের ন্যায় ফলমূল গঙ্গাজল বিল্বদল "এতে গন্ধে পুষ্প" দিয়া তোমার পূজা করি নাই। আমি মূঢ় পৌত্তলিক নহি, আমি পরম জ্ঞানীর ন্যায় নিরন্তর তোমার মহিমা ধ্যান করিয়াছি। তোমার গূঢ়তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিয়াছি। তুমি কৃপালু, আমি তোমার প্রসাদে তোমার অগাধতত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছি, তোমার জয় হউক। আমি তোমার মহিমা জগতে প্রকাশ করিব। ইতি প্রস্তাবনা।

তাসখেলা এই জটিল সংসারের অস্তিস্পন্দন অনুলিপি। প্রথম খেলা,—

খেলা এই সংসার লীলা। অনেকে বলেন যে চতুরঙ্গক্রীড়া অতি উত্তম, কেননা প্রতিদ্বন্দী দুই জনে সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্র রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল; যাহার বুদ্ধি বিদ্যা বা বিচক্ষণতা থাকিবে, সেই জয় লাভ করিবে। এটি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ঘোর অনৈসর্গিক। কোথায় দেখিয়াছেন যে, রণে হউক, বনে হউক, কর্ম্মস্থানে হউক, বিলাস ভবনে হউক, শিক্ষায় হউক, পরীক্ষায় হউক, কোথায় দেখিয়াছেন, যে দুই জনে সমান উপকরণ লইয়া প্রবিষ্ট হইল? কোন ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন যে, দুই দল যোদ্ধা সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্রে পরস্পরকে অভিবাদন করিয়াছে? জীবনে কোথায় দেখিয়াছেন, দুই জন সমবোধ সমান উপকরণ পাইয়াছে? তা হয় না। তা পায় না। বৈষম্যই জগতের নিয়ম; সাম্য তাহার ব্যভিচার মাত্র। তবে কেন খেলিবার সময় আমরা সমান উপকরণ লইয়া বসিব? কেন অপ্রাকৃত শিক্ষা লাভে আমরা যত্নবান্ হইব? চতুরঙ্গ ক্রীড়া আমাদিগকে অতি ভুল শিক্ষা প্রদান করে। তাসখেলায় তাসের বৈষম্য সংস্থাপনই নিয়ম, সুতরাং তাসের একটি প্রশংসার কথা।

চতুরঙ্গের ক্রীড়ক সংখ্যা ও ক্রীড়া পদ্ধতিও অস্বাভাবিক। সংসারে মাত অথবা সাথী না থাকিলে চলে না; খেলাতেও মাত চাই। সংসারে সহায় নাই কার? যার নাই, তার আর খেলা কি? সে কিসের সংসারী? তাহার খেলিবার উপায়ই নাই। যাহারা তোমার অতি নিকটে, বাম পার্শ্বে, দক্ষিণ পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহারা তোমার মাত নহে, তোমার প্রকৃত বন্ধু সম্মুখে সর্ব্বদাই আছেন; তোমার স্বার্থে তাঁহার স্বার্থ, কিন্তু তোমার প্রতিদ্বন্দীদের ন্যায় তিনি তোমার নিকটে থাকিতে চান না। সংসারে, হিন্দু সংসারে, পতির যে একমাত্র সহায়, দুখের দুখী, সুখের সুখী, ব্যথার ব্যথী, আহ্লাদে আহ্লাদিনী, বিষাদে অবসন্না, সেই সঙ্গিণী, সংসার খেলার সেই মাত, কখনই তোমার নিকট কুটুম্বিনী হইতে, তোমার নিজ গোত্র হইতে, পরিগৃহীত হইতে পারে না। দূর বংশ হইতেই তুমি তোমার মাত পাইয়াছ।

তাস ক্রীড়ায় দেখুন, মাতের দোষে কত সময় কত ফল ভুগিতে হয়; মাতের গুণে কত সময় কত লাভ হয়। মনুষ্য সমাজের গাঁথনিই এই রূপ। যদি তুমি সৌভ্রাত্রসুখ আস্বাদন করিতে চাও, তবে তোমার সহোদর ইচ্ছা পূর্ব্বক কদন্ন সেবন করিয়া গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহার রোগ শান্তির জন্য কিছু দিন রাত্রি জাগরণ করিয়া অনশনে কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া কষ্টভোগ কর। যদি প্রণয়িণীর প্রণয় প্রার্থনা কর, তবে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রণয় গঠনে প্রবৃত্ত হও। যদি অপরূপ পিতৃস্নেহে অভিষিক্ত হইবে, তবে পিতার কঠোর শাসনে ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি এ সকল কষ্ট স্বীকার করিতে না চাও, তুমি কোন সুখই পাবে না। মানব সমাজ তোমার জন্য নহে। সুখ দুঃখ বিনিময়ই এ বিপণির ব্যবসায়। তুমি এ সব না চাও, আমরা তোমায় চাই না। তুমি সন্ন্যাসী। এই সকল কারণেই সংসারে মাতের বা সঙ্গীর সৃষ্টি এবং তাহারই অনুলিপি তাসের গ্রাবু খেলায়।

চতুরঙ্গ ক্রীড়াতে সকল উপকরণই প্রকাশ্য ও সাজান। তাস খেলায় কাহার হস্তে কি আছে কেহ জানে না, কেহ কোনরূপ নিয়মিত

সাজান উপকরণ পায না। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবে তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি এই এই উপকরণ লইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি? তুমি যদি তোমার সমুদয় উপকরণ বলিয়া দিয়া সমরক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হও, তাহা হইলে তুমি নির্ব্বোধ। তোমাকে নিশ্চয় হারিতে হইবে। হতে পারে তুমি এমন তাস পাইয়াছ যে, তুমি মাতের সাহায্য না লইয়া কাহাকেও ভয় না করিয়া এক হাতেই, নিজ হাতেই, ছক্কা করিতে পার, তখন তোমার উপকরণ ভার বলিয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই বরং সেত আর তখন বিলক্ষণ স্পর্দ্ধার কথাই বলিতে হইবে। কিন্তু এক হাতে ছক্কা করা যায়, এমন তাস কয়জন কয়বার এ সংসারে পাইতে পারে? বাস্তবিক জগতে উপকরণ সর্ব্বদাই গুপ্ত থাকে। পরচিত্ত অন্ধকার; এবং ইহলোকে আমাদের পরচিত্ত লইয়াই ব্যবসায় সুতরাং প্রধান উপকরণই গুপ্ত রহিয়াছে; যে গুপ্ত অনুমান করিতে পারে সেই বিষয়ী; প্রকাশিত উপকরণ চালনা করিতে পারিলেই কি, না পারিলেই কি? তবে উপকরণ কাহার স্থানে কি আছে, তাহা কি রূপে অনুমান করিবে। তাস খেলায় যাহা কর, সংসারেও তাহাই কর। অথবা সংসারে যাহা করিতে হয়, তাস খেলায় তাহাই আছে। এক ব্যক্তির কি উপকরণ আছে, জানিতে হইলে আমরা কি করি? তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করি, তিনি কখন কি কার্য্য করিলেন, সেটি বেশ করিয়া পর্য্যালোচনা করি, তাহার পূর্ব্বাধিকারীর স্থানে কি পাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করি, স্মরণ করিয়া অনুমান করি। তাস খেলাতেও তাহাই করি। ইনি যখন ছুটা দশের উপর তুরুপ করিলেন না, তখন ইহার স্থানে নিশ্চয় তুরুপ নাই। ইনি ইস্কাবনের দশ দিলেন, আর হাতে ইস্কাবনের টেক্কার পিটে, ইস্কাবনের টেক্কার পরেই দশ ছিল, তবে টেক্কা, এঁর স্থানেই আছে; আমার মাতের হাতেত নাই, থাকিলে তিনি এমন সময় ফাই ভেঙ্গে ও রঙ খেলিবেন কেন? আমার দক্ষিণ-দিকের দ্বন্দ্বী স্থানেও নাই, থাকিলে কেন আমার সাহেবের উপর তুরুপ করিবেন। তবে টেক্কাটা এঁর স্থানেই আছে। যা সংসারে করি ঠিক্ তাই করিলাম।

তাস খেলার কাটানও সংসারের অনুলিপি। কাটান সংসারে প্রবেশ—বা জন্ম পরিগ্রহ। এক জন্ম পরিগ্রহেই সমস্ত উপকরণ নির্ণীত হইয়াছে, জন্মই বলুন আর কাটানই বলুন, একেবারে সম্পূর্ণ অদৃষ্ট মূলক। আপনার জন্মের উপর কাহার হাত আছে? তুমি কেন হাজার বিদ্যাবুদ্ধি লাভ কর না, তোমার জন্ম ফলভোগ তোমাকে করিতেই হইবে। কেবল জন্ম বৈগুণ্যেই দেখ ঐ ব্যক্তি শৃঙ্খলবদ্ধপদে মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছে। সে যদি আঢ্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিত, তাহা হইলে তাহাকে উদরপূর্ত্তি জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না। আর বিচারপতি সাহেবও তাহার শেষ বিচারের দিন তাহাকে "নীচ নরাধম" উপাধি দিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিতেন না। তাস খেলায় এক জন কিছু না পাইয়া যদি হারিয়া যায়, তবে সে কি নীচ নরাধম, তা যদি না হয়, তবে চোর কি করিয়া হইল? জিজ্ঞাসা করিবে, তবে কি সকলেই পেটের দায়ে চোর হয়? তাহা কে বলিতেছে? তিনখানা তুরুপেও অনেকে যে নওলা ধরা দিতেছে। তাস খেলায় যেমন বোকা আছে—সংসারে তাহা অপেক্ষা অধিক বোকা আছে! তবে যে পেটের দায়ে নীচ, তাহাকে যে নীচ বলে, সে আরো নীচ!

কাটান যদি জন্ম পরিগ্রহ হইল, তাহলে এখন তুরুপ কি তা বোঝাগেল! জাতিগতবৈলক্ষণ্যজনিতপ্রাধান্যই তুরুপ! প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ তুরুপ, এখন ইংরাজই তুরুপ। কোথাও অসভ্য জনগণ মধ্যে ক্ষত্রিয়ই তুরুপ, আবার কোথাও বৈশ্য তুরুপ। প্রাচীন কালে ড্রুইড, পোপ, পাদরি, সাগিক পারসী, ও ব্রাহ্মণ পৃথিবীর নানা স্থানে ধর্ম্মতুরুপ ছিলেন। এখন পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ধন তুরুপ এবং বোধ হয় কালে বিদ্যাবুদ্ধিই তুরুপ হইবে।

ধনীরাই রঙ্, আর সকলেই বদরঙ্। ধনীর জন্ম পরিগ্রহই জগতে প্রচারিত হইল। কাটান কি তা জানাগেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ধনী কে, তাও জানা গেল, বদরঙ্ কি তা বোঝা গেল।

চারি রঙ্ যে কি তাহা কিন্তু, কিছুই বোঝা যায় নাই। প্রাচীন কালে সমাজের যে চারিভাগ ছিল ইহা তাহাই মাত্র। যে ইস্কাবন সে ইস্কাবনই

আছে, তবে কাটানর জন্যই ইস্কাবনের সাতাও এখন হরতনের টেক্কা অপেক্ষা অধিক বলশালী। যে শূদ্র সে নামে এখনও শূদ্রই আছে, কেবল জন্মগুণে সে দেখ উচ্চ গদির উপর আসীন। সে এখন তুরুপ বলিয়াই ঐ দেখ শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর অভিজিৎ ছত্তন ও বাল মুকুন্দ দত্তবৎ তাঁহার দুয়ারের দুয়ারী। সে এখন তুরুপ হইয়াছে বলিয়াই বেগের গাঙ্গুলী হরিরামের সন্তান ঐ পাঁচকড়ি গোমস্তা নীচে মসিপূর্ণ ছিন্নশপে বসিয়া বাবুর গোলাল গালাল কানকোন হাস্‌লিপদক পরান ছেলেটিকে কোলে করিতেছে। এখন তুরুপ হয়েছে বলিয়াই ইস্কাপনের সাত্তা হরতনের টেক্কার উপর হইল কি না? ছেলেবেলা ভাবিতাম এরূপ খেলার সৃষ্টি কেন হইল? কে করিল? এখনও এই সমাজের খেলার কথা ভাবি যে, এ খেলায় সৃষ্টি কেন হইল? কে করিল? উভয়ই মনুষ্য করিয়াছে। যখন গ্রাবু খেলিতে বসিয়াছ, তখন তুরুপের বল মানিতেই হইবে। তুরুপ বেশী না পাও বিরক্ত হইও না। যাহা পাইয়াছ তাহাতেই খেলিতে হইবে। খেলাতে কোন চুকভুল না হইলেই হইল। আর খেলিতে না চাও, তাহলেত কথাই নাই। আর যদি এবার বেশী তুরুপ পাইয়া থাক, তাহলে একেবারে গর্ব্বিত হইও না, হয়ত সাততুরুপ হইলেও হইতে পারে। এহাত "এই হইল আর হাত কি হইবে, তার স্থির কি আছে? ছক্কা পঞ্জা বেখে খেলা ভেঙ্গে উঠে যেতে পার, তবেই ভাল; কিন্তু মনে থাকে যেন তোমার ৪ খানা কাগজ ও এক ছক্কা এক হাতেই উঠিতে পারে। অতএব ধনী তাস খেলা মনে করে একটু সাম্য অবলম্বন কর।

সাততুরুপ আটতুরুপে খেলে না কেন? এটি প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে সমতা রাখিবার চেষ্টা মাত্র। বাহ্য দর্শনে সকলেই দুই পদ, দুইহস্ত, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, লইয়া—জগৎ খেলায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু জন্ম বৈলক্ষণ্যে এক ব্যক্তি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগত ক্ষয়রোগগ্রস্ত ও নির্ধনী—আর অপর ব্যক্তি বলিষ্ঠ ও ধনবান্, ইহাকেই পূর্ব্ব অদৃষ্টের ফলাফল বলিতেছিলাম। আমরা ষোলখানা পাইয়াছি, তোমরাও ষোলখানা পাইয়াছ, কিন্তু আমার ষোলখানা এমন কাগজ, যে তাহার প্রত্যেক খানায় যে বল ধারণ

করে, তাঁহা তোমার সকল গুলিতে একত্র নাই। তাসদেব একটু দয়া করিয়া নির্ধনীব দিকে একটু মুখতুলে চাহিয়াছিলেন। যদি ধনী তুমি নির্ধনীর সঙ্গে খেলিতে চাও, তাস বিধাতা বলিতেছেন, আমি এই নিয়ম করিলাম যে তুমি সমস্ত ধন (তুরুপ) নিজে লইও না, অথবা তাহার সপ্ত গুণক পরিমিত ধন লইওনা।—এত বৈষম্য আমরা দেখিতে পারিব না। তাস বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। সমাজবিধাতৃগণ, শাসন কর্তৃপক্ষ, যদি সকল সময় এই রূপ নিয়ম করেন, তাহা হইলেও ত কতক মঙ্গল হয়; অনেক সময় তাঁহারা তাহা করেন না। অনেক সময় সাত তুরুপেও এক তুরুপে খেলিতে বসাইয়া খেলা দেখিতে থাকেন। হে ফল-কাবতার! তাঁহারা তোমার অবমাননা করেন। তুমি প্রেমারা মূর্ত্তিতে তাঁহাদের লক্ষ্মীর হাঁড়িতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ কর। আমার প্রার্থনা পূরণ কর, তোমার মঙ্গল হউক। সকলেই শুনিয়া থাকিবেন যে, সাততুরুপের পর পড়তা ফিরিয়া যায়। তাস খেলায় তাহা নিত্য হয় কি না তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। সামান্য ব্যক্তিগণ মধ্যে, বা খণ্ড সমাজে প্রায়ই হয় না।—কেন না, শাসনকর্ত্তৃগণ অনেক সময় সাততুরুপের আইন মানিয়া চলেন না কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যে এরূপ সাততুরুপ মধ্যে মধ্যেই হইয়া থাকে ও পড়তাও ফিরিয়া যায়। পুরা-কালের দৃষ্টান্তে, পুরাণ কথায় কাজ কি? তাহাতে শ্রদ্ধাই বা কে করিবে? আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখাইলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাততুরুপের অথবা আটতুরুপের প্রধান দৃষ্টান্ত ফরাশিস বিপর্য্যয়। এটি আটতুরুপ, হাতের কাগজ পর্য্যন্ত গেল। আর একটি দৃষ্টান্ত আয়র্লণ্ড বাসীদিগের দেশত্যাগ ও আমেরিকায় নূতন পড়তা লইয়া খেলা আরম্ভ করা। তৃতীয় সাততুরুপে মহাজন পীড়িত সাঁওতালগণেব রাজবিদ্রোহ। চতুর্থ স্পেইনে রাজবিপ্লব; পঞ্চম এখন চলিতেছে ইংলণ্ডে শ্রমোপজীবিগণের Strike অর্থাৎ এক মতে অধিক বৃত্তি প্রার্থনা করা, তাহারা এত দিন সাততুরুপে খেলিতেছিল, হারিতেও ছিল; আর তাহারা তুরুপ না পাইলে কিছুতেই খেলিতে চায় না। হে লালকালফোঁটাসমন্বিতপঞ্চাপতাকা

চিহ্নধারিন্! তুমিই তাহাদের মনে এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছ। আমরা তোমাকে সুতরাং ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চারি রঙ্গ সমাজের পূর্ব্বকালিক চারি টি ভাগমাত্র। কোন রঙ্গটি কোন ভাগ ছিল? উত্তর। হরতন, রুইতন, ইস্কাবন ও চিড়িয়ার এই চারিরঙ্গ। ইহাদিগকে ইংরাজিতে (Heart) বা হৃদয়, (Diamond) বা হীরক, (Spade) বা কৃষিযন্ত্র ও (Club or dagger) অথবা যুদ্ধাস্ত্র কহে। ভারত বর্ষের জনগণের এখন যে রূপ ভাগ এও ঠিক তাই। এখনকার ভাগ ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র লইয়া নহে। এখন শূদ্রেরা একটু উন্নতি পদবী প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা ক্রীতদাস নহে। কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করিতে তাহাদিগকে এখন কেহই নিষেধ করিতে পারে না। এখন বৈশ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কতক কৃষিজীবী, তাহারা শূদ্র ভাবাপন্ন। কতক কুসিদজীবী বা আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ব্যবসায়ী। ইহারাই, দক্ষিণে ভাওজি, রাওজি, পশ্চিমে শ্রেষ্ঠী বা শেঠিয়া, আর্য্যাবর্ত্তে আগরওয়ালা বা মারওয়ারি বা কাঁটিয়া এবং বঙ্গে বণিক। তাসের ভাগ দেখুন। যে পরের হৃদয়ের উপর বিশ্বাসের উপর আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে কি? সে ধর্ম্মযাজক বা ব্রাহ্মণ, তিনি হরতন। যে হীরা মণিমুক্তাদি লইয়া জীবিত থাকে সে কি? সে জহুরি বা বণিক্, বৈশ্য বা ধনী; তিনি রুইতন। কৃষিযন্ত্রই যার জীবনের একমাত্র উপায় বা চিহ্ন সে কৃষী, শূদ্রই বলুন বা বৈশ্যই বলুন তিনি ইস্কাবন। আর গদা বা তরবারি যে ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন তা কেঁ না জানে? সুতরাং তাসের ভাগ সমাজের ভাগের প্রতিরূপ মাত্র।

চারি রঙ্গ যদি এইরূপই হইল, তবে সাত্তা আট্টা এ সব কি? সাত্তা হইতে টেক্কা একটি হিন্দু পরিবারের প্রতিকৃতি। কিন্তু কোনটি কি, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সংসারে আমরা প্রাধান্য স্বীকার দুইভাবে করিয়া থাকি। একজন প্রভুত্ব করে, আমরা সেই প্রভুত্বের দাসত্ব করিতে বাধ্য হই, বলিয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার করি। আর কতকগুলি লোককে আমরা মান্য মর্য্যাদা সম্ভ্রম

গৌরব আদর ইত্যাদি স্বতঃই প্রদান করিয়া থাকি। তাস খেলাতেও এইরূপ দুই প্রকার প্রাধান্য গণনা আছে। এক ফোঁটা গণনা আর এক উপর্য্যুপরি গণনা। দওলা তিন খানা তাসের পর বটে কিন্তু ইহার মর্য্যাদা বিস্তর। মর্য্যাদায় ইহা দ্বিতীয় গণিত কেবল টেক্কার নীচে মাত্র। সাহেব গণনায় টেক্কার নীচে বটে, কিন্তু তেমন আদর নাই, ফোঁটা গণনায় তিন ফোঁটা মাত্র। কেন এমন হয় তাহা ক্রমে বলিতেছি। বলিয়াছি যে সাত্তা হইতে টেক্কা একটি হিন্দু পরিবারের প্রতিকৃতি। সাত্তা হইতে টেক্কার ক্রমে বয়োধিক্য জনিতই একের উপর অন্যের সংস্থান বুঝিতে হইবে।

সাত্তা অবিবাহিতা কন্যা।

আট্টা তাই; তবে বয়োধিক্য বশতঃ সাত্তার উপর বটে। হিন্দু পরিবার মধ্যে ইহাদিগের আবার কি গৌরব থাকিবে? অনেকেই মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া নারীজাতির উপর আমাদিগের সাম্য দৃষ্টির চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদান করেন। বচনের শেষ ভাগটি এই—

কন্যাপ্যের পালনীয়া

শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

কন্যাকেও পালন করিবে, অতি যত্নে শিক্ষা দিবে। মহাত্মা মনুর অবমাননা হয় এমন কথা আমাদের লেখনীমুখ হইতে সহজে বহিষ্কৃত হইতেছে না। তবে তাঁহার বচনোদ্ধৃতকারকদিগের দোষ তাঁহাকে শিরে ধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মে পতিত না হই, এমন করিয়া বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের তুলনা করিলে আর অবমাননা কি হইল? বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মত্বাভিমানী ব্রাহ্মণের বাটীতে কখন শূদ্র ভোজন দেখিয়াছেন? মনে করুন, গৃহস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দালানে দণ্ডায়মান, শ্রীবিষ্ণু, দালানের থামে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। ভৃত্যে তাঁহাকে পাখা করিতেছে, বেলা সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর; পল্লীর নবশাখগণ নূতন ঘাসছোলা, তিনবার গোবর দেওয়া, প্রাঙ্গণে উঁচু হইয়া বসিয়া ভোজনে ভোর। বাঁড়ুয্যে মহাশয় পরিবেশকদিগকে

বলিলেন "ওহে শূদ্রদেরও লাউচিংড়ি আর বদে দিও।" এই হইল "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" সুতরাং সাত্তা আট্টার কি ক্ষমতা থাকিবে ?

নওলা। অবিবাহিত বালক; অবশ্য অনুজা ভগিনীদিগের উপর ইহার প্রভুত্ব আছে। আর যখন বড় মানুষের ছেলে অর্থাৎ তুরূপ হয়, তখন তাহার কথা পরে বলিব।

দওলা। নবোঢ়া বধূ। বাড়ির কনে বৌ। এঁর গৌরব কেবল দ্বিতীয়গণিত। আহা! বঙ্গ পরিবার মধ্যে নবোঢ়া বধূর আদর দেখিলে কাহার না কনে হইতে ইচ্ছা হয়? বৌ মা সর্ব্বদা অলঙ্কারে ভূষিতা, ভাল সাটী পরিহিতা, ধনীগৃহে— দাসীমণ্ডলীপরিবেষ্টিতা, কাঙ্গালীরগৃহে—নিভৃতদেশে গুণ্ঠনাবৃতাস্থিতা। মনুষ্যের যে অবস্থাই হউক না কেন, বৌয়ের আদর কত! পুতের বৌ, তিনি কোলে কোলে ফিরিতেছেন। যদি কর্ত্তার ভোজন হইল, তবে এখন বৌমার খাবার কি? বৌকে খাওয়ালে, বৌকে শোয়ালে শাশুড়ীর, পরিবারের কতই আনন্দ। "বাছা পরের মেয়েকে আপনার করিতে হইবে।" আহা বঙ্গাঙ্গনাগণ! কেন তোমরা চিরকালই বৌ থাক না? আহা দওলার গৌরব কত গৌরব!

গোলাম। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। গোলামকে ইংরাজিতে (Slave) এবং (Knave) উভয়উপাধিপ্রদত্ত হইয়া থাকে। (Slave) শব্দে গোলাম (Knave) শব্দে পাজি, সেই জন্য গোলামের আর একটী নাম পাজিও বলা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে ব্যবহৃতও হইয়া থাকে। বাস্তবিক ধূর্ত্ততা গণনা করিয়া ইহার স্থানাবধারণ হইয়াছে। সে কথা পরে বিস্তৃত করিয়া বলা যাইবে; এক্ষণে সাধারণতঃ গোলাম পুরুষ বলিয়া গৌরবে এক ফোঁটা মাত্র, জ্যেষ্ঠ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চারিতাসের উপর। বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন গুণ নাই, তবে পেজোমি পূর্ণ। সে গুণের কি ফল ফলে, পরে দেখিবেন।

বিবি। প্রৌঢ় বঙ্গ মহিলা। বাড়ির বড় বৌ। যখন কনে বৌ তখন ইহার গৌরব দশ ফোঁটা ছিল, এখন দুই ফোঁটা মাত্র। বাড়ির

গৃহিণী—বয়সে তৃতীয়া—তিনি, সর্ব্বদাই বঙ্গ সংসার লইয়া ব্যস্ত, কে তাহাকে আদর করিবে। তাঁর সময়ে আহার হয় না, রাত্রিতে শোবার অবকাশ নাই, দিবসে কথার অবকাশ নাই। কর্ত্রী বটেন কিন্তু দাসী। যাহাকে সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইল, সে সকলের দাসী বই আর কি বলিব? তবে তিনি ধনশালীর বনিতা হইলে কখন কখন তাঁহার কিছু বিশেষ গৌরব হয়, কিন্তু সে কথা পরে বক্তব্য। সাধারণতঃ তিনি বঙ্গ মহিলা, কর্ত্রী, গৌরবে কেবল পাজি হইতে অর্থাৎ গোলাম অপেক্ষা কিছু অধিক।

সাহেব। বঙ্গীয় কৃতী পুরুষ। তাহাতেই ইহাঁর নাম সাহেব। সাহেবেরাই কৃতী। ইনি কর্ত্রীর অগ্রে ভোজন করিতে পান, কিন্তু কনে বৌ দওলার পরে। "এই যে বৌমাকে খাওয়াইয়া আসিয়া তোমাকে ভাত দি।" সাহেব ছয় তাসের উপর কিন্তু গণনে তিন ফোঁটা।

টেক্কা। বাড়ীর কর্ত্তা। সাধারণতঃ ইহার মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, প্রভুত্ব সকলি অধিক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি আদরে কনে বৌকেও ইহাঁর পরে গণনা করিতে হয়। প্রভুত্বে কৃতি সাহেবকেও ইহাঁর অধীনে থাকিতে হয়। ইনি টেক্কা, ইহার চিহ্ন এক। কর্ত্তা কি এক জন ভিন্ন দুই জন হয়? গণনায় ইনি একাদশ। এক পাজিনু এগার গুণ।

তবে তুরুপের সময় এমন বিপর্য্যস্ত হয় কেন? তাহার কারণ আছে। সে হইতেছে নাকি ধনীদের কথা, সধারণ নিয়ম হইতে একটু বিপর্য্যস্ত হইবে বই কি? যে ধনী অথচ পাজী, পৃথিবীতে সেই বড় লোক। সে রঙ্গের গোলাম। সেই কর্ত্তা, সেই কৃতী, কিন্তু অথচ পাজি বলিয়া সে কৃতী হইতে কত গুণ; কর্ত্তা হইতে কত গুণ অধিক। গোলাম গৌরবে টেক্কার প্রায় দ্বিগুণ, প্রভুত্বে কর্ত্তার উপরিস্থিত। অমুক মুখুয্যে বড় লোক। কেন জান? তিনি ধনী আর পাজি। তাঁর মত ধনীও বিস্তর আছে, পাজিও বিস্তর আছে, কিন্তু তাঁর এত প্রশংসা কিসে? না তিনি ধনী পাজি। রঙ্গের গোলাম। বাপ রে! তাহাতেই রঙ্গের নওলা দ্বিতীয় তাস। বড় মানুষের ছেলে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, কাজেই উদ্ধতস্বভাব; সুতরাং বিক্রমশালী ও সমধিক গৌরবান্বিত। গৌরবেও দ্বিতীয় প্রভুত্বেও

দ্বিতীয়। বাইরণ ছেলেবেলা কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের নাম পত্রে লিখিত ছিল "এই কাব্য লর্ড বায়রণ নামক কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বিরচিত"। সমালোচক ক্রম সাহেব এই কথার উপর নানা উপহাস করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কিসের জন্য গ্রন্থের প্রশংসা করিব? নাবালগের লেখা বলে? না লর্ডের লেখা বলে? না---নাবালগ লর্ডের লেখা বলে? আমরা উত্তর দিতেছি। নাবালগ লর্ডের লেখা বলে। এক জন নওলা শ্রেণীর লোকের লেখা বলে। সংসারে সকলেই যাহা করে, বায়রণের গ্রন্থ প্রকাশক তাহাই করিয়াছিলেন মাত্র, ক্রমের এতটা উপহাস করা ভাল হয় নাই। বিশেষতঃ আমরা তাসভক্ত লোক, নওলার নিন্দা আমাদের সহ্য হইবে কেন? ঐ যে অমুক কুমার বড় ঘোড় সওয়ার হইয়াছেন, ইহার অর্থ কি? অর্থ যে তিনি বড় মানুষের ছেলে, ঘোঁড়ায় চড়েন, আর দুখারি লোককে চাবুক মারেন, কেননা তিনি বড়মানুষের ছেলে, সুতরাং উদ্ধতস্বভাবান্বিত। তিনি এক জন নওলা। ছোট বাবুর আদরের কথা সকলেই জানে। ছোট বাবুর দৌরাত্ম্য উপদ্রব সকলি অধিক, সুতরাং নওলা গৌরবে ও প্রভুত্বে কেবল পাজি গোলামের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন মাত্র।

এক্ষণে তাস খেলায় আরো একটী অতি সুমহৎ উপদেশ পাওয়া যায়। তাস খেলায় বিন্তি আছে, পঞ্চাশ আছে, শ আছে, ও ইস্তক আছে। তিন খানা তাস একত্র হইলে এক কুড়ির কার্য্য করে, পাঁচ খানা একত্র হইলে একবারকার খেলায় জয় হয় ও খেলা শেষ হয়। তোমরা দুই কোটি প্রজায় আর্ত্তনাদ করিলে কি রাজার এক বিন্দু অশ্রুপাতও হইবে না? তা কখনই নহে। একতাই উন্নতির মূল, একতাই সমাজের বন্ধন, একতাই জীবন, একতাই জাতিযোগের ভিত্তিভূমি। একজন অপ্রাপ্ত ব্যবহার নওলা ও দুই জন বঙ্গকুমারী সাত্তা আটা একত্র মিলিত হইলে, কর্ত্তা কর্ত্রী ও কৃতীর সহিত তুল্য বল ধারণ করে। একতা এইরূপ পদার্থ বটে। যে তিন তাসের কিছু মাত্র গৌরব নাই, একত্র হইয়াছে বলিয়া তাহারা এখন গৌরবে প্রধান তিন তাসের সমকক্ষ হইল। বঙ্গবাসীগণ

তাস খেলিবার সময় যখন লিক্তি বলিয়া ডাকিবে, তখন একবার তোমার ভ্রাতার সহিত যে মোকদ্দমা চলিতেছে, তাহা স্মরণ করিও। যদি গোঁড়া হিন্দু হও, তবে এক বার আধুনিক নব্য সম্প্রদায়কে—নব্য বলিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া, খ্রিশ্চান বলিয়া, নাস্তিক বলিয়া,—অভক্ষ্য ভোজী জানিয়া, যে আধুনিক হিন্দুয়ানির সাম্প্রদায়িক ঘৃণা প্রদর্শন কর, তাহা একবার স্মরণ করিও। নব্য ভ্রাতৃগণ! আপনারাও এক বার বিদ্যাগম্ভীর মানসসম্ভূত যে অপূর্ব্ব বিদ্বেষ ভাবটী বড়ো বোবা পৌত্তলিকদের প্রতি প্রদর্শন করেন, তাহা এক বার স্মরণ করিবেন। তাহা হইলেই তাসাবতারের কার্য্য সিদ্ধি, আর আমি এই অবতারের অদ্বৈত প্রভু অভিষেক কর্ত্তা গোঁসাই, আমারও মনস্কামনা সিদ্ধি হইবে।

ইস্তকও একতাস গুণের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু এবার দম্পতি মিলন। ধনবান ব্যক্তি যদি ধনশালিনী কন্যার সহিত একযোগ হয়েন, তাহা হইলে সাধারণের তিন জনের মিলনের ন্যায় গৌরবান্বিত হইবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? সাধারণের দম্পতি মিলনের গৌরব কি? সেত হতেই হবে। যাহাদের মধ্যে সচরাচর হয় না তাহাদের মধ্যে হলেই না গৌরব? আমাদের দুখান রূপ দেখিয়া কে তৃপ্ত হইবে? তবে দম্পতি প্রণয়ের কথা? সমাজ, বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গসমাজ, কবে দম্পতি প্রণয়ের গৌরব করিয়াছে? সে তোমার ঘরের কথা। তুমি তাহাতে সুখী হও, আমরা সমাজ, তাহার জন্য কিছুই করিতে পারি না—তবে বড়মানুষের স্ত্রীপুরুষের মিল। তা গৌরব করা উচিত বটে। ইস্তকে এক কড়ি দেওয়া গেল।

যেমন শ্রেণীবদ্ধ পাঁচজনের মিলে এক শত হয়, তেমনি চারিবর্ণের এক রূপ লোক একত্রিত হইলে, সেই "শত" গৌরব পায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণের এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক একত্র হইলে যে গৌরবের কথা হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে চারিজন কনে বৌয়ে, বা নবোঢ়া বধূতে একত্রিত হইয়া কি করিতে পারে? তাহাদের আপনাদের যে চল্লিশ সংখ্যার গৌরব আছে, তাঁহারা যদি নিজ কুলে থাকিয়া যান, তবেই সে কুলের

গৌরবের বৃদ্ধি করিলেন। নতুবা তোমার কুল এই কবিয়া তাহাদিগকে লইয়াগিয়াছে, খেলার শেষ গণনায় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীরই গৌরব বাড়িল।

সেই রূপ চারিজন অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক বা বালিকা একত্র হইয়া কি করিতে পারিবে? এই জন্য চারিসাত্তায়, চারি আটায়, চারি নওলায়, চারি দশে, শ হয় না।

হাতের পাঁচ। কোন সংগ্রামে যে পক্ষ শেষ যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহার কিছু অতিরিক্ত গৌরব করিতেই হয়। শেষ জয়ের সুখ্যাতির নামই, হাতের পাঁচ। কিন্তু যেমন খেলায় নির্ব্বোধ আছে, তেমনি সংসারে তদপেক্ষাও নির্ব্বোধ আছে। সংসারে কৃপণ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল হাতের পাঁচ রাখিবার জন্যই যাবজ্জীবন ব্যস্ত, কিন্তু হাতের পাঁচ রাখিলেন অথচ গণিয়া দেখেন যে ছকুড়ি সাত নাই। আগে খেলা রাখ, তার পর হাতের পাঁচের চেষ্টা কর। তা না করিলে তুমি বড় নির্ব্বোধ।

যে হাতের পাঁচ রাখিয়াছ, শেষ রক্ষা করিয়াছে, অথচ খেলা আছে, সে পর হাতে কাগজ তাসিবে। শেষ যুদ্ধে আমি জয়ী। এক্ষণ আমি যেখানে শিবির স্থাপন করিয়াছি তোমাকে আসিয়া সেই খানে লড়াই দিতে হইবে। গত বৎসর তোমায় আমায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে কারবার করিয়া তোমার চৈত্র মাসের শেষে বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, এক্ষণে বৈশাখের প্রথমে তোমার দর লইয়াই আমাকে কারবার করিতে হইতেছে। অর্থাৎ তোমার হাতের পাঁচ ছিল, তুমিই কাগজ দিলে। তুমি কাগজ দিয়াছ, তোমার কতক গুলি সুবিধা, এখন তোমায় আমায় যদি দুই জনে এক রকমের বিন্তি পঞ্চাশ ডাকি, তাহা হইলে আমার গৌরব অধিক হইবে। বাস্তবিক মধ্যস্থ হইতে হইলে এই রূপ বিচার করাই উচিত।

আর কুড়ি খানি কাগজের কথা বাকি আছে। এ গুলি সামান্যতঃ গৌরবচিহ্ন মাত্র। যত দিন তুমি গৌরবের পাতশাই পাঞ্জা উড়াতে না পারিলে, ততদিন তোমার গৌরব ঢাকা থাকাই বিধেয়। অর্থাৎ চারি খানা পর্য্যন্ত কাগজ উপুড় করিয়া ধরিও। সংসারের একটী রীতিই এই যে, তুমি চারিবার অনেক কষ্ট করিয়া যে খ্যাতিপত্তি টুকু সঞ্চয় করিলে,

তোমারি একবার খেলা না হওয়াতেই তাহা তৎক্ষণাৎ লীন হইয়া গেল। তবে যদি তুমি একবার পাঞ্জা জাহির করিয়া থাক, তাহা হইলে পাঁচ হাত অন্ততঃ না গেলে তুমি আর একেবারে হীনগৌরব হইবে না। পাঁচ হাত নাহিলে পঞ্জা উঠে না। ছক্কা বড় বাড়। পঞ্জার উপর এক ফোঁটা। ছতোম যাহাদিগকে সহরের হঠাৎ অবতার বলেন, তাঁহাদেরই চিহ্ন এই তাসের ছক্কা। তাঁহারা ভোগাইতে আসেন, ভোগাইয়া চলিয়া যান। ধূমকেতুর ন্যায় গগনপথে উদিত হইল; শিখায় গগনের একদেশ উজ্জ্বলীকৃত হইল, কত লোকের মনে কত অশুভ ভাবনা সেই সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল। কিন্তু কত কাল যে স্থায়ী হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যখন গেল, হঠাৎ চলিয়া গেল। এই যন্য ভাল খেলওয়ারে ছক্কা করিবার বড় আস্থা প্রদর্শন করে না। খেলাতে পঞ্জা, ছক্কা কেবল বৃথা জাঁক জমক মাত্র।

তাস খেলা যে সংসারের অবিকল প্রতিরূপ, তাহা আমরা এক প্রকার দেখাইলাম। কিন্তু অতি গূঢ় কথা এখনও বলি নাই। সংসারের অতি গূঢ় বিদ্যা কি? জুয়াচুরি। তিনি বড় পাকা, লোক বলিলে কি বুঝায়, যে তিনি একজন জুয়াচোর। তোমার হাতে কিছুমাত্র তাস নাই, কিন্তু তুমি এমনি মুখভঙ্গী করিতেছ যে সকলেই মনে করিল, তুমি এক জন আঢ্য লোক। তুমি তাসে পাকা খেলোয়ার হইলে, সংসারে তুমি পাকা লোক হইলে। যখন "খেলার গুরু কেননাই" আমরা বলি, তখন যেন মনে থাকে, যে তিনিই এই লোকযাত্রার গুরু। তবে তাস খেলার সময় আমরা স্বীকার করি, ভবের খেলাতে স্বীকার করাটা বড় প্রথা নয়।

সকল কথাই বলা হইল। এখন হে তাসদেব! তোমার বাওয়ান্ন-পীঠ মূর্ত্তিতে একবার আবির্ভূত হও। হইয়া তোমার ঊনপঞ্চাশ মূর্ত্তি আমার ঊনপঞ্চাশ অবয়বে ভর কর; আর তোমার প্রধান তিন মূর্ত্তি আমার লেখনী মসী ও কাগজে আশ্রয় কর, আমি এক বার,—

"কথাচ্ছলেনবালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।"

সাত্তা আট্টা কুমারীগণ! তোমাদের গৌরব কি এক্ষণে বুঝিতে পারিলে ত?

নওলা ভাই! যদি তুরুপের হও ত মনে করিও যে বিপক্ষের গোলামে তোমাকে লইয়া যাইতে পারে।

দওলা ভগিনী! কুলে থাকিলেই কুলের গৌরব; কিন্তু রাঙ্গালায় যত দিন কনে থাকিবে, তত দিনই তোমাদের সুখের দিন, অতএব শীঘ্র ঘোমটা খুলিও না।

অহে গোলাম। অদৃষ্টক্রমে এবার তুরুপের হয়েছ, মনে থাকে যেন, বদ রঙ্গের বেলা তোমার গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা কম।

বিবি, সাহেব, কত্রি! ও কৃতি!—তোমাদিগকে আমার আর কিছু বলিতে হইবে না। কিন্তু ধনী ও ধনশালিনী! যেন ইস্তকটা কি তাহা মনে থাকে।

টেক্কা কর্ত্তা মহাশয়! বদ রঙ্গের সময় আপনাকে রঙ্গের সাত্তা দলন করে বলে, আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না। ফিরে হাতে কি হয় দেখিবেন?

ভাই খেলওয়ারগণ তুরুপ পাইবার সময় যেন সাত তুরুপ মনে থাকে, আর হাতের পাঁচ রাখিতে গিয়া যেন খেলা খোয়াইও না। মহাপ্রভু তাস! যদিও আমি অদ্বৈত এবং তোমার গুরু, কিন্তু তুমি ভবাবতার, তোমাকে নমস্কার করি।